

## কথামৃত – ষষ্ঠ পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita  
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math  
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

### সার্কাস রঙ্গালয়ে – গৃহস্থের ও অন্যান্য কর্মীদের কঠিন সমস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২ সালে ঠাকুর সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন। আমরা এখন দেখব সার্কাস দেখতে গিয়ে ঠাকুর কি ভাবছেন এবং কি বলছেন।

আগের আলোচনাতে একটা ছোট প্রশ্ন এসেছিল। আজকের আলোচনা শুরু করার আগে আমরা সেই প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করছি। প্রশ্নটা ছিল কার্য-কারণ সম্পর্ককে নিয়ে। আমরা মনে করি সব কিছুতে কার্য-কারণের একটা সম্পর্ক আছে। সেখান থেকে আমরা মনে করি – আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি, ঠাকুর আমাকে দেখবেন। কিন্তু জিনিসটা একেবারেই তা নয়। ঠাকুর ওখানে যখন ঐশ্বর্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সেখানে তিনি এটাই বলতে চাইছিলেন। সেটাকে নিয়ে একটা প্রশ্ন এলো, গীতায় ভগবান বলছেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, দুটো তো মিলছে না? কিন্তু জিনিসটা তা না।

যে কোন শাস্ত্রে একটা শব্দ প্রায়ই আসে, শব্দটা হল ‘অর্থবাদ’। ‘অর্থবাদ’এর অর্থ, একটা বিদ্যার বা কোন গ্রন্থের স্তুতি করা। অধ্যাত্ম রামায়ণ আমাদের খুব বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ, সেখানে প্রত্যেক অধ্যায়ের পর গ্রন্থস্তুতি করা হয়েছে – যারা এই অধ্যায় পাঠ করবে তার এটা হবে, সেটা হবে ইত্যাদি। গীতাতেও শেষের দিকে বলছেন, গীতা পাঠ করলে এই হয়, সেই হয়; সব গ্রন্থেই অর্থবাদ করা হয়। বিভিন্ন ধর্মে যে অনেক কথা বলা হয়, সেখানে কোন এক ইষ্টের নাম করে এটাও বলা হয় যে, এটা মানো, তাহলে এই রকমটি হবে। এর মধ্যে কতটা অর্থবাদ, কতটা সত্য আমরা জানি না। গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান যে বলছেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, এখানে যোগক্ষেমের অর্থ হল – কোন মানুষ যোগ সাধনা করতে চাইছে, এই সাধকের জীবন চালানোর জন্য যতটুকু দরকার, সেটুকু ভগবান দিয়ে দেবেন। ঠিক ঠিক ভক্ত যিনি, ঠিক ঠিক যোগী যিনি, তাঁর চাহিদা আস্তে আস্তে কমে যায়। এই কথা ঠাকুরও বলছেন, পরে যা কথামৃতে আমরা পাব – ভক্ত হল রাজার ব্যাটা, তার মাসোহারা ঠিক সময় মত চলে আসে। কিন্তু সেখানে বক্তব্যটা হচ্ছে, ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই আসবে।

আর ভক্ত যত বড় হয়, তার চাহিদাও তত কমে যায়। ঠাকুর শেষ সময়ে কিভাবে কত কষ্ট পাচ্ছেন; পয়সা নেই, চাঁদা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। স্বামীজীকেও পদে পদে কত কষ্ট পেতে হয়েছে, শ্রীশ্রীমা কত কষ্ট পেয়েছিলেন। ঠাকুর দেখবেন, মা আছেন চিন্তা কি; অনেক সময় উৎসাহ দেওয়ার জন্য এগুলো বলা হয়। আমাদের কথামৃতের আলোচনা যাঁরা শুনছেন, আমি ধরেই নিচ্ছি, এনারা কেউ সাধারণ মানুষ নন। দিনের পর দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে কথামৃত পাঠ করা, দিনের পর দিন কথামৃতের আলোচনা শোনা, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে ক্লাশগুলো হয় সেখানে টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়া, কষ্ট করে ক্লাশে আসা, গরমে একটা ঘরে শাস্ত্রের কথা এতক্ষণ বসে শোনা – এই পুরো জিনিসটা যে কত উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরের ব্যাপার, ভাবাই যায় না। মানুষ যদি আধ্যাত্মিক ভাবে একটু উন্নত না হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন ধৈর্য ধরে এই ক্লাশগুলো শুনতে পারত না।

আমরা এখন আজকের মূল আলোচনায় আসছি। সার্কাস রঙ্গালয়ে ঠাকুরের আগমন, বুধবার, ১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২। উদ্বোধন প্রকাশিত বইয়ের ১০৬ পাতা। আপনারা যদি বইটা নিজে থেকে

পড়েন, দেখবেন খুব সহজ বর্ণনা। ঠাকুর সার্কাসে গেছেন, সেখানে ঘোড়ার উপর বিবি এক পায় দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। ঠাকুর এই দৃশ্যটা দেখে বলছেন – সংসার করা খুব কঠিন, ইত্যাদি। এগুলো না বোঝার কিছু নেই। সংসারে যাঁরা আছেন, সংসারের যে দাবানল, যে জ্বালা, তাঁরা খুব ভাল ভাবেই বোঝেন। সংসার-জ্বালা থেকে বেরোতে চাইছেন, সংসার থেকে মুক্তি চাইছেন, কিন্তু বেরোতে পারছেন না, সবাই এই ব্যাপারটা জানেন, বোঝেন। ঠাকুর ভগবান, মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন; তিনি সাধারণ কথা বলার জন্য, খোশ গল্প করার জন্য আসেননি। ঠাকুর একটা যে সাধারণ কথা বলছেন, তার পিছনেও যে একটা বিরাট জীবনদর্শন রয়েছে, তার পিছনে যে পুরো হিন্দু আধ্যাত্মিক ভাব রয়েছে, এটাকে একটু জানলে কি হয়, আমাদের মন একটু উপরে উঠে আসে।

ইউটিউবের কমেন্টসে হঠাৎ একজন লিখল, একটু বিবেকচূড়ামণি করলে ভাল হয়। বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, এগুলো শাস্ত্র নয়। হিন্দুদের শাস্ত্র, অনেকবার আলোচনা করেছি – বেদ। বেদের মূল হল প্রার্থনা। আট-দশটা প্রার্থনা বুঝে নিতে পারলে, আপনি মোটামুটি বুঝে নেবেন বেদের বক্তব্য কি। বেদের বক্তব্যগুলিকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে তার যে অন্তর্নিহিত দর্শন, সেটাকে উপনিষদে রাখা হয়েছে। উপনিষদগুলি ঠিক ঠিক অধ্যয়ন করলে হিন্দু ধর্মের মূল ভাব জানা হয়। সেটাকেই কথা কাহিনীর মাধ্যমে বাল্মীকি রামায়ণে, বিশেষ করে মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। তন্ত্র একটা প্যারালাল সাবজেক্ট। মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থে আরেকটু গুছিয়ে জিনিসটাকে খুব ছোট্ট মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে – মানুষ কি করবে আর কি করবে না। এর বাইরে থেকে যায় ষড়্দর্শন। এই কটির বাইরে অন্যান্য যত গ্রন্থ আছে, এরা হল সিঁড়ির ধাপের মত।

এই শাস্ত্রগুলো আমাদের পড়া নেই বলে দুটো সমস্যা আসে। প্রথম সমস্যা হল, নিজের ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞতা থেকে যায়। ঠাকুর বলছেন, বাবুর কত ঐশ্বর্য বাবু নিজেই জানেন না, এটা কিন্তু সেই অর্থ নয়। এই জিনিসটা হল পুরোপুরি অজ্ঞান। এটা হল, কিছুটা এই রকম গালাগালি দিয়ে বলা – তার বাপের ঠিক নেই, তার মায়ের ঠিক নেই; এটা ঠিক তেমনি। তুমি ধর্মে আছ কিন্তু নিজের ধর্মের কথা জান না। তোমার একটা গোত্র আছে, গোত্র কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, এর পিছনে কি সত্য নিহিত আছে; কিছুই জানা নেই। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যদি আপনি যান, তখন এর ভাষা এটাই হবে – তার বাপের কোন ঠিক নেই। দ্বিতীয় হল, শাস্ত্র যখন আপনি শুনতে থাকেন, তখন আপনার মন ধীরে ধীরে গুছিয়ে আসে। সংসারে যে কষ্ট রয়েছে, সংসারের যে জ্বালা রয়েছে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভিতরে একটা শক্তি আসে, ওই শক্তি দিয়ে কিছু সময়ের জন্য সংসারের এই জ্বালা-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। এটাই যখন শাস্ত্রে পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তখন সংসারে, এই জগতে যে সমস্যাই আসুক, লড়াই করা যায়। এখানে ঠাকুরের যে সহজ কথাগুলো রয়েছে, শাস্ত্রের গভীরতম যে সত্যগুলি রয়েছে, সেগুলোকে আধার করে আমরা এই সহজ কথাগুলোর ব্যাখ্যা করব।

১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২, কার্তিক মাস। মাস্টারমশাই ঠাকুরের বর্ণনা করছেন – **শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় – মাতালের ন্যায়**। মনটা যখন অন্য দিকে থাকে, বিশেষ করে বয়স্কদের দেখবেন, কোন কারণে একটা প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছেন, কান্না পাচ্ছে, হয়ত কাঁদছেন; দুজন লোক ধরে আছে, তখন তাঁর পা কোথায় পড়ছে তিনি বুঝতে পারবেন না। কারণ মন তখন ঠিক নেই, ফলে নিউরো-মোটর কানকেশানটা তখন এলোমেলো হয়ে যায়; পা ঠিক ভাবে পড়ে না। ঠিক তেমনি, ঠাকুর যদি একটু ভাবের অবস্থায় চলে যান, খুব গভীর চিন্তায় যদি চলে যান, পা ঠিক ভাবে পড়বে না।

গাড়িতে বসে আছেন, মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন – **গাড়ির একবার এধার একবার ওধার মুখ বাড়াইয়া বালকের ন্যায় দেখিতেছেন**। এই চারটে লাইনে গুটি কয়েক খুব সুন্দর কথা বলছেন। আমাদের একবার দিল্লী যেতে হয়েছিল, দিল্লী আমার পুরনো জায়গা, আমাদের অনেক বই বড় বড় প্রকাশকদের দিয়ে ছাপানো হয়। প্রকাশক কোম্পানীর একজন বড় কর্তাকে একদিন মজা করে বললাম, ‘ভালই হল,

সন্ধ্যাবেলা আপনার ওখানে যাব, দোকানে কফি খেয়ে আসব’। ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে বলছেন – ‘আপনারা কফি খান’? তারপরে বলছেন, ‘দোকানে কফি খান’? আমার হাসি পেয়ে গেল, দোকানে কফি খাব না তো কোথায় খাব। লোকেদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে বিচিত্র বিচিত্র ধারণা। ঠাকুর এসে প্রথম এই জিনিসটাকে ভেঙে দিলেন। তারপর স্বামীজীর জীবনধারা যখন খুব কাছ থেকে দেখছি, তখন এই ধারণাগুলো একেবারেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সাধুর জীবন মানে – ভিতরে তোমার ত্যাগ থাকবে, বাইরেও ত্যাগ থাকবে। কিন্তু তাই বলে সংসারী যে সব কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছে, তা না। আমাদের ঠাকুরের আইসক্রিম ভাল লাগে, তখনকার দিনে আইসক্রিম ছিল না, কুলফির মত জিনিস পাওয়া যেত, সেটা ঠাকুরের খুব ভাল লাগত। কিন্তু স্বামীজীর আবার আইসক্রিম খুব প্রিয় ছিল।

ঠাকুর এখন ঘোড়াগাড়ি করে যাচ্ছেন, কলকাতা শহর দেখছেন; সার্কাস দেখতে যাচ্ছেন, মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছেন, কিন্তু মনটা পুরোপুরি ডুবে রয়েছে ঈশ্বরে। এখান থেকেই অনেক সময় হিপক্রেসি শুরু হয়। আমাদের এখানে একজন ব্রহ্মচারী জয়েন করেছিলেন, পরে ছেড়ে চলে গেছেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে পা-টা না ধুয়ে, জামা-কাপড় না পালটে সোজা গর্ভগৃহে ঠাকুরের আরতি করতে চলে গেল। ওখানকার যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি বললেন, ‘আরে একটু জামা-কাপড়গুলো পালটে নাও’। ব্রহ্মচারী রেগেমেগে বলতেন – ‘পবিত্রতা ভিতরে’। একেবারেই তা না, বাহ্যিক পবিত্রতারও দরকার। ঠাকুর কিন্তু এমন অবস্থায় আছেন, ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। তা সত্ত্বেও তিনি কলকাতা শহর, শহরের আশেপাশে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখছেন।

শহর দেখতে দেখতে গাড়ি করে যাচ্ছেন, হঠাৎ বলছেন, **দেখ, সব লোক দেখছি নিম্নদৃষ্টি। পেটের জন্য যাচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই।** নরেনকে যেদিন প্রথম দেখলেন, ঠাকুর দেখে অবাক, দৃষ্টি কেমন উচ্চ। এই জিনিসটা একটু কঠিন হলেও অতটা কঠিন না। আপনি দেখবেন, আপনার মন একটু যদি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, আপনিও বুঝতে পারবেন কার মন কোন দিকে। খুব নামকরা কথা – চোরের মন বাঁচকার দিকে। চোরের মন যে বাঁচকার দিকে থাকে, একটু এলার্ট থাকলে বোঝা যায়। আপনি কোন বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে গেছেন, সেখানে যদি কেউ আনমনা হয়েও থাকে, এটা বোঝা যায়, লোকটি এই জিনিসগুলো পছন্দ করছে না, চোখমুখ একটু অন্য রকম। ঠিক তেমনি, একটা লোক একটা জায়গায় অস্বস্তি বোধ করছে, তার যে ভাল লাগছে না বোঝা যায়। এই সংসার-বাজারে একটা লোকের ভাল লাগছে না, এটা বোঝা যায় যদি আপনি একটু আলাদা হয়ে থাকেন।

লোকেদের এই নিম্নদৃষ্টি দেখে ঠাকুর খুব কষ্ট পাচ্ছেন। লকডাউনের সময় একটু সময়ের জন্য বাজার খুলতেই সব লোক বাজারের দিকে দৌড়াচ্ছে, দেখেই বোঝা যেত সবাই দৌড়াচ্ছে। তার মধ্যে এক আধজন আছে, যার হয়ত কোন দরকার নেই, এমনি ঘুরতে বেরিয়েছে। ঠাকুর আধ্যাত্মিক দিক থেকে এটা বুঝতে পারছেন, বলছেন – পেটের জন্য সব যাচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি না হওয়ারই কথা। আগেকার দিনে যে সমাজ ছিল, সেই সমাজে যে যে কাজই করুক, তার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে এই ভাবটা নষ্ট হয়ে গেল, বিশেষ করে ইংরেজরা এই দেশে আসার পর। আর ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। আর ইদানিং আমেরিকার যে পুঁজিবাদী মডেল, তার ফল আজকে আমরা চোখের সামনে দেখছি। গ্রাম গ্রাম থাকল না, সমাজ সমাজ থাকল না। আর করোনার সময় মানুষের এমন দুর্যোগ যে, একটা আনাজও তাদের কপালে জুটত না, যেটা কয়েক বছর আগে আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। টাকা-পয়সার দিকে মানুষ এমন দৌড়াল যে, যখন বিনাশ দোর গোড়ায় এসে গেল, তখন আর মানুষ এটাকে সামলাতে পারছে না।

‘শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌঁছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষশ্রেণীর টিকিট’। মানে সব থেকে কম দামের টিকিট, অনেক পিছন থেকে সার্কাস দেখতে হবে। ঠাকুরের ভক্তদের কারণে কাছে এটুকুও পয়সা নেই যে ঠাকুরকে নিয়ে

সামনের দিকে ভাল জায়গায় বসবেন। আমার একজন পরিচিত, একটু বড়লোক, দিল্লীতে থাকেন। তিনি আমাকে বলছিলেন, কি দুরবস্থা, একটা সিনেমা দেখতে গেলে দু হাজার টাকা লাগে। কিসে এত টাকা? কি একটা পপকর্ন হয়, ওসব খেতেই নাকি চারশ পাঁচশ টাকা লাগে। একজন একটা সিনেমা দেখছে দু-হাজার টাকার টিকিটে, শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। ঠাকুর ভগবান, অবতার; আজকে ঠাকুরের নামে শত শত রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্টার, হাজার হাজার যুবক তাদের নিজের জীবন ঠাকুরের পায়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে শুধু ঠাকুরের সেবার জন্য। অনেক ধরণের বড় বড় লোক, দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা, সবাই এসে ঠাকুরের নামে মাথা নত করছেন। তিনি যখন সশরীরে ছিলেন তখন তাঁর এতটা পয়সাও নেই যে, সার্কাসটাকে একটু সামনে বসে ভাল করে দেখবেন। সেখানে গিয়ে ভক্তরা ঠাকুরকে নিয়ে একটা উঁচুস্থানের বেঞ্চিতে বসালেন।

তাতেই ঠাকুরের আনন্দ, “বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়”। যাই হোক, এখানে সার্কাসের বর্ণনা আছে, সার্কাসে যেমন হয়, বিভিন্ন কুলাকুশলীরা নানা রকমের খেলা দেখায়। এখানে একটা খেলার বর্ণনা করে বলছেন, একটা মেয়ে, ‘বিবি’ বলছেন, বিদেশীনি হবে হয়ত; ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে আছে, রিংএর মাঝখান দিয়ে ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে, বাঁপিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে পড়ছে। সার্কাস শেষ হল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নেমে এসে ময়দানে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে সবুজ বনাত, কাছে ভক্তরাও দাঁড়িয়ে আছেন। এবার কথা বলছেন।

দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বনবন করে দৌড়াচ্ছে! কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ওইরূপ কঠিন। খুব সত্যি কথা, সত্যিই সংসার করা খুব কঠিন কর্ম। আমরা সন্ন্যাসীরা তো দিনরাত দেখছি, আমাদের বন্ধুরা যারা ভক্ত নয়, ভক্তরা যারা আমাদের বন্ধু নয়, সবাই আমাদের কাছে কত সংসার-কান্না নিয়ে আসেন, সবারই কষ্ট। আমরা কি বলব! কেউ এসে বলছে, তার ঠাকুরদা মারা গেছেন, একশ বছর বয়স; কেউ এসে বলছে তার মা মারা গেছেন, নব্বই বছর বয়স – সবাই কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ এসে বলছে, পঞ্চাশ বছরে তার স্ত্রী মারা গেছে, কি স্বামী মারা গেছে। সবাই কেঁদে আকুল। এই একটা জীবন আমরা পেয়েছি, জীবনকে একটা প্ল্যাটফর্ম করে আমরা উপরের দিকে উঠে আসি। অপরের জন্য হল – এর সঙ্গে ছিলাম, বেশ কথাবার্তা করতাম, সে চলে গেল। এর বেশি কোন কিছুর দাম নেই আর বেশি জড়াতে নেই। এই জিনিসটা বারবার অভ্যাস আমরা করি না, তাই কেঁদে মরতে হয়।

অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। এখানে ঠাকুর ঈশ্বরদর্শনের কথা বলছেন না, সংসার করার কথা বলছেন। শুধু সংসার করতে পারাকে নিয়ে বলছেন –অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ সংসার করতে পেরেছে। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন, সবাই সংসার করে যাচ্ছে। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের ইয়ং ছেলেরা এসে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা নিয়ে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে ঠাকুর, যিনি কিনা অবতার, তিনি বলছেন, অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ সংসার করতে পারে। কতটা কঠিন আমরা এ-ভাবে বুঝতে পারি –মহাভারতে খুব নামকরা গল্প আছে, যুদ্ধের সময় অর্জুনকে ফাঁসানোর জন্য চক্রব্যূহ রচনা করা হল। দুর্যোধনের ভগ্নিপতি জয়দ্রথ বর পেয়েছিল, একদিন যুদ্ধে সে অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের সবাইকে হারাবে। পরের দিন চক্রব্যূহ রচনা করা হয়েছে। এদিকে কৌরবরা কায়দা করে অর্জুনকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু পাণ্ডবদের বাকি চারজনের কেউ জানে না চক্রব্যূহ কিভাবে ভেদ করতে হয়। এগুলো কাহিনী, কাহিনীকে খুব সিরিয়াসলি নিতে নেই, একটা জিনিসকে বোঝানোর জন্য এসব কাহিনী। অভিমন্যু এসে বলছে, মায়ের গর্ভে যখন ছিল তখন সে চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল শিখেছে। অভিমন্যু তখন বাচ্চা ছেলে, ষোল-সতের বছরের। তার সারথি হলেন, শ্রীকৃষ্ণের যিনি সারথি। অভিমন্যু বলছে, ‘আমি জানি কিভাবে এটাকে ভেদ করতে হয়, কিন্তু কিভাবে বেরিয়ে আসতে হয়ে, সেটা আমার

জানা নেই’। ভীম বলছেন, ‘আরে আমি আছি, তুমি একবার ঢুকে পড়ো, এরপর গদা দিয়ে আমি সব চুরমার করে দেব’।

সেনা যখন সাজানো হয়, তখন সেখানে কিছু কিছু ছিদ্র থাকে। এখন চক্রব্যূহে যেখান দিয়ে ঢুকবে তার মুখে জয়দ্রথ দাঁড়িয়ে আছে। অভিমন্যু পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে পড়ে না, তাই অভিমন্যু সহজে জয়দ্রথকে হারিয়ে দিয়েছে, সেও ঢুকে গেল। জয়দ্রথকে এই বর ভগবান শিব দিয়েছিলেন, এই বরের জোরে কোন পাণ্ডব আর ব্যূহের মধ্যে ঢুকতে পারল না। সারথি বারবার অভিমন্যুকে বলছেন, ‘অভিমন্যু তুমি বাচ্চা, তুমি যেও না, তুমি পারবে না’। অভিমন্যু বলছে, ‘আরে কোন ব্যাপার না, তুমি নিশ্চিত থাক’। তার সারথি তখন মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে বললেন – ‘আজকে আমার প্রাণ আর বাঁচবে না, আমার আয়ু শেষ। কিন্তু ঠিক আছে, আমার সারথির কাজ, আমার কাজ হল যোদ্ধাকে নিয়ে যাওয়া, যদি মরতে হয় মরব, কি আর করার আছে’। ঠিক তাই হল, অভিমন্যু গেল, গিয়ে ফেঁসে গেল। তার রক্ষায় কেউ এগিয়ে আসতে পারল না।

আমরা সংসারে কখন নামি? যে-মুহুর্তে আমাদের জন্ম হয়। যে-মুহুর্তে আমাদের জন্ম হল, সেই মুহুর্তে আমরা সংসারে নেমে গেলাম। সেখান থেকে যেমন যেমন আমরা এগোচ্ছি – বন্ধু-বান্ধব আসছে, সংসার; বিয়ে-থা হচ্ছে, সংসার; সন্তান উৎপাদন হচ্ছে, সংসার – সবটাই সংসার। আমরা ওর মধ্যে ডুবেই যাচ্ছি, চক্রব্যূহের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছি। কদাচিৎ কোন বিজ্ঞ পুরুষ, সদগুরু, সত্যিকারের সন্ত-মহাত্মা যাঁরা আছেন, আমাদের জীবনে এসে তাঁরা সাবধান করেন। পুরোটা ছাড়ার কথা তো বলবেন না, কারণ আমরা পারব না; সেইজন্য বলেন, একটু দূরে থাক। কিন্তু আমরা তাও পারি না, আমরা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যখন মরি, তখন কাঁদি। সেই কান্না আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছায়।

এই যে সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়া, এটা কেন হয়? এই ঝাঁপিয়ে পড়া জিনিসটাকে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ইউটিউবে কয়েকজন লিখেছেন, তাঁরা ব্রহ্মসূত্র পড়তে চান। যাঁরা ব্রহ্মসূত্র পড়তে চেয়ে লিখেছেন, জানিনা তাঁরা জানেন কিনা ব্রহ্মসূত্র জিনিসটা কি। ব্রহ্মসূত্র পড়ার কারুরই দরকার পড়ে না। কারণ উপনিষদে কিছু কিছু মন্ত্র আছে, যেখানে আপাতভাবে বিরোধ রয়েছে, ব্রহ্মসূত্র সেটাকে সিনথেসাইজ করে। যদি কারুর মূল দশটি উপনিষদ ঈশো থেকে কেন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এগুলো পড়া না থাকে, আগাগোড়া পড়ার পর যদি এটা মনে হয়, এই মন্ত্র মিলছে না, সেই মন্ত্র মিলছে না; সেটার উত্তর ব্রহ্মসূত্রে দেওয়া আছে। ব্রহ্মসূত্র হল একটা cohesive philosophy of Upanishads। লোকেরা ব্রহ্মসূত্রের একটা নাম শুনে নিয়েছে, সেখান থেকে মনে করছে, তাকে ব্রহ্মসূত্র পড়তে হবে। ব্রহ্মসূত্র খুব উচ্চমানের গ্রন্থ; বেদান্ত দর্শনে তিনটি গ্রন্থ, উপনিষদ, গীতা আর ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের উপর অনেকের ভাষ্য আছে। হিন্দু ধর্মের যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন, প্রায় সবাই ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য লিখেছেন। শুধু শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য নেই, আরও অনেকের আছে। ব্রহ্মসূত্রের উপর শত শত ভাষ্য আছে। ইদানিং কালে একজন শক্তি মতের পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করেছেন।

প্রত্যেক ভাষ্যকাররা নিজের ভাষ্য শুরু করার আগে একটা ভূমিকা দেন, যাকে উপোদ্ঘাৎ বলা হয়। আচার্য শঙ্কর নিজের ভাষ্য শুরু করতে গিয়ে যে ভূমিকা দিচ্ছেন, সেখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – *যুস্মাদ্ অস্মাদ্ প্রত্যয়।* সংস্কৃতে *যুস্মাদ্* শব্দের অর্থ ‘তুমি’ দিয়ে যা কিছু বোঝায়, অর্থাৎ আমার সামনে যেটা আছে। *অস্মাদ্* শব্দের অর্থ ‘আমি’। এই জগতে ‘আমি’ আর ‘তুমি’ এই বোধটা খুব দৃঢ়। ‘তুমি’ হল বিষয় আর ‘আমি’ হল বিষয়ী (subject and object)। আচার্য বলছেন বিষয় আর বিষয়ী এই দুটোর মধ্যে কি রকম তফাৎ? আলো আর অন্ধকারের মধ্যে যে তফাৎ। আমি আর এই সংসারে কতটা তফাৎ? আলো আর অন্ধকারের তফাৎ - দুটোই সম্পূর্ণ বিপরীত, কোন মিল নেই।

ফলে কি হয়, এই আমি আর তুমি, দুটো কখনই এক অপরের হতে পারে না। Subject কোন দিন object হবে না, object কোন দিন subject হবে না। দুটো যে শুধু কোন দিন মিলবে না তাই না, এই দুটোর যে কিছু কিছু গুণ রয়েছে, এই গুণগুলোও কখন এক অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারবে না। আগুনের ধর্ম কোন দিন জলের হবে না, জলের ধর্ম কোন দিন আগুনের হবে না। সৃষ্টির দিক থেকে জল আর আগুনের তাও কিছুটা মিল আছে। ‘আমি’ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, শুদ্ধ আত্মা। আমি এই সমর্পণানন্দ না, আমি শুদ্ধ আত্মা। আর *যুস্মদ্* প্রত্যয় বলতে বোঝায় – এই সংসার। এই দুটোর মধ্যে কোথাও কোন মিল নেই। সেইজন্য এক অপরের সঙ্গে কোনদিন পাল্টে যেতে পারে না। শুধু তাই না, এর স্বভাবের সাথে ওর স্বভাবের কোথাও কিছু মিলবে না। আচার্য তাই বলছেন, এক অপরের সঙ্গে পালটে যায় না, দুধ দই হয়ে যায় না। কিন্তু এর ধর্ম ওর উপর চেপে যায়। যদি আপনাদের একটু আগ্রহ থাকে যে, এই কথাযূত আদি গ্রন্থে বা শাস্ত্রে জিনিসটাকে কিভাবে দেখে, তার পিছন যে দর্শনটা আছে, সেটা যদি বুঝতে চান, এই *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়ের* এই আলোচনা খুব সুন্দর, এটা অনেক কিছু সংশয় পরিষ্কার করে দেয়।

বক্তব্য হল, আমি চৈতন্য আর জগৎটা জড়। চৈতন্য কোন দিন জড় হবে না, জড় কোন দিন চৈতন্য হবে না। আর চৈতন্যের কোন কিছু জড়ের সঙ্গে মিলবে না, জড়ের কোন জিনিসও চৈতন্যের সঙ্গে মিলবে না। একটা জিনিসকে আমরা যদি মেলাতে যাই, তার জন্য কোন একটা meeting point থাকতে হয়। ইদানিং কালে দেখবেন প্রায়ই হয়, বিয়ে করল, কিছু দিন পরে বলে – there is nothing common between us। তাহলে কি হবে? বিয়ে ভেঙে গেল। জড় আর চৈতন্য ঠিক এই রকম, এদের কোন কিছু মিল নেই, কোথাও কোন meeting ground নেই। কিন্তু তাও মিলে যাচ্ছে কি করে? বলছেন, এক অপরের উপর অধ্যাস করে। এই ‘অধ্যাস’ শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরের দিকে এই অধ্যাসকে আমরা মায়া বলে চালিয়ে দিয়েছি।

অধ্যাস মানে মিথ্যা জ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞানে এ ওর উপরে চেপে যায়, ও এর উপরে চেপে যায়। জড়ের কিছু গুণ দেখে মনে হয় চৈতন্যের, চৈতন্যের কিছু গুণ দেখে মনে হয় জড়ের। এনারা এই উদাহরণ দেন— জলের উপর যদি তপ্ত লোহা ফেলে দেওয়া হয়, তখন গরম লোহা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অন্য দিকে জলটা একটু গরম হয়ে যায়, এক অপরের প্রপার্টিটা নিয়ে নেয়। এটা কেন হয়? বলছেন, অবিকের জন্য হয়। বিবেক মানে, যার দ্বারা আমরা দুটো জিনিসকে আলাদা করতে পারি। বিবেকের অভাবের জন্য এর ধর্ম তার উপর, তার ধর্ম ওর উপরে চলে আসে। এখানে মনে রাখতে হবে, এই যে আচার্য বলছেন, *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়* আলো অন্ধকারের মত তফাৎ, কোন দিন এরা এক হতে পারে না; ঠিক সেইভাবে আমি কোন দিন সংসারী হব না, সংসারও কোন দিন আমার মত হবে না। তার মানে সংসার কোন দিন চৈতন্য হবে না, আমি কোন দিন জড় হব না। কিন্তু আমার চৈতন্য সত্তার ধর্ম সংসারের উপর আর সংসারের ধর্ম আমার উপর চাপবে, এটা হতে থাকবে। এই অধ্যাস যখন এসে যায়, এর স্বভাব যখন এর উপর চেপে যায়; এটা কিন্তু পাল্টাচ্ছে না, এই transformation কিন্তু আসল না, এটা just চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জিনিসটা কি রকম? আচার্য উপমা দিয়ে বলছেন, সন্তান আছে, স্ত্রী আছে, তাদের এমন ভালবাসছেন যে, তারা যদি ভাল থাকে, মনে করছেন আমিও ভাল আছি। তাদের যদি কিছু খারাপ হয়ে যায়, মনে করছেন, আমার খারাপ হয়ে গেল। স্ত্রী পুরো আলাদা, আপনি যদি কাল মরে যান, স্ত্রী যেমন আছে তেমন পরে থাকবে। আপনি যদি মরে যান, আপনার সন্তান যেমন আছে, তেমন পরে থাকবে। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছেন ততদিন আপনাকে এদেরকে দেখতে হবে; অবশ্যই দেখতে হবে, এটা আপনার কর্তব্য। কর্তব্য জিনিসটা এক, আর তার সঙ্গে মিশে যাওয়াটা পুরো আলাদা। মিশে যাওয়াটা মানে, মনে করছে যে এটাই আমি।

এতে কি সমস্যা হয়? তখন আচার্য বলছেন – অহম্ এষাম্ মমেতি, আমি এদের, এরা আমার। একটা সম্পর্ক হতেই পারে। বাসে করে যাচ্ছি, বাসের ড্রাইভারের সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে। অনেক লম্বা সফর যদি করতে হয়, তখন বাস ড্রাইভার, কণ্ডাক্টরের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে যায়। একরাত বা দু-দিন ট্রেনে যাওয়ার সময় সহযাত্রীদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হয়ে যায়। তাই বলে আমি আর ড্রাইভার বা ট্রেনের সহযাত্রী এক, এটা কখন হয় না। সফর শেষ, সম্পর্কেরও ইতি।

এই যে অধ্যাস, এই চাপাচাপি কত রকমের হয়? আচার্য বলছেন, নিজেকে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে জুড়ে দেয়, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে জুড়ে দেয়। আর শরীরের ধর্ম যখন আত্মার উপর চাপিয়ে দেয়, তখন কি বলে? আমি মোটা, আমি রোগা, আমি ফর্সা, আমি দুর্বল, আমি সবল, এই ধরণের কথা বলে। আর আমি এটা করছি, আমি এটা করব, আমি সেখানে যাব; এর মধ্যেই সবাই পুরোপুরি ডুবে আছে। আর যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মার উপর চাপিয়ে দেয়, তখন বলে –আমি বোবা, আমি অন্ধ, আমি কালা। তোমার আইডেনটিটি কি? বোবা। তোমার আইডেনটিটি কি? কালা। তুমি যে শুদ্ধ আত্মা এটা ভুলেই যাচ্ছে? ফলে কি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়কে চাপিয়ে দিচ্ছে আত্মার উপরে, চাপিয়ে দিয়ে সব সময় নিজেকে ওই ভাবে দেখছে। এরপর আসে মন; এই মনকে যখন আত্মার উপর চাপিয়ে দেয়, তখন সে এটাই বলতে শুরু করে –আমার বুদ্ধি আছে, আমার কম বুদ্ধি, আমি চিন্তা করছি, সেই করছি।

ফলে কি হয়? এই যে সংসার, এটাই হয়ে যায় অধ্যাসের খেলা। আমরা সংসার বলতে মনে করি ঘর-সংসার, এই সংসার তা না; এর মধ্যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবটাই জড়িয়ে আছে। অথচ জড় আর চৈতন্যের কোথাও জড়ানোর কথা না। কারণ প্রত্যেক ধর্মের আচার্যরা বলে গেছেন, তুমি এই দেহ নও, মন নও, কেউ কারো নও; তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তুমি ঈশ্বরের সন্তান। তোমার বাস্তব স্বরূপ অন্য কিছু। কিন্তু আমরা করোনার সময় সারাদিন টিভিতে, মোবাইলে, কম্পিউটারে করোনার খবর দেখে যাচ্ছি। করোনার জন্য সমস্যা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সরকার আছে, সরকার দেখছে, এটা সরকারের কাজ। তারা আপনাকে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেই দায়িত্বটা পালন করে দিন, মিটে গেল।

পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন আমাদের এই সমস্যা নিয়ে এসেছে। শর্ট টার্ম গোল, লং টার্ম গোল; জীবনে আমাদের এই করতে হবে, সেই করতে হবে। কিন্তু আমাদের ক্লাশগুলো যদি শুনে থাকেন, Carving Sky যদি পড়ে থাকেন, সেখানে আমরা বারবার বলছি – Philosophy of life is greater than life itself। জীবন থেকে জীবন-দর্শন অনেক মহৎ। আপনাদের কারুর জীবন-দর্শন আছে? করোনার জন্য দেড় মাস আমাদের ক্লাশগুলো বন্ধ, আমি মহা খুশী। এই দেড় মাসে আমার একটা বই দশ বছর ধরে আটকে ছিল, ওটাকে লিখে আমি নামিয়ে দিয়েছি। আমার প্রথম বই টিয়া বইয়ের ড্রাফট তার থেকে আড়াই গুণ বেশি। এখনও কাজ অনেক বাকি আছে। তার মানে, আমার একটা জীবনধারা আছে, যেখানে ক্লাশ নেওয়া আছে, কথা বলা আছে, এটা একটা কাজের অঙ্গ। আগাথা ক্রিষ্টি এক জায়গায় বলছেন –কাজ না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। ম্যাগাজিনগুলিতে দেখি লিখেই যাচ্ছে, সময় কি করে কাটাবেন। কারণ, আপনাদের কোন জীবন-দর্শন নেই।

সেদিন দেখলাম এক স্বামী-স্ত্রী অনলাইন লুডো খেলছে। স্ত্রী জিতে গেছে, স্বামী রেগে এমন লাথি মারল যে, স্ত্রীর মেরুদণ্ডটাই ভেঙে গেল। এটা একটা জীবন? তোমরা আবার নিজেদের হিন্দু বল? জপধ্যান করতে পারবেন না মানছি, শাস্ত্র পড়তে পারবেন না মানছি, কিন্তু তাই বলে আপনার কোন জীবন-দর্শন থাকবে না? সবটার জন্য আপনাকে নির্ভর করে থাকতে হবে ইন্টারনেট, টিভির উপর আর বাহ্য জগতের উপর? একেবারে পশু-পর্যায়ে চলে গেছেন! জীবন-দর্শন নেই বলে আজকে এই দুরবস্থা। সারাদিন একই নিউজ দেখছেন, একই বস্তা পচা খবর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শুনে যাচ্ছেন। কাল যদি আপনি মরে যান, যে রোগেই মরুন, ওই রোগ কি আপনার সঙ্গে যাবে? যাবে না। কি যাবে সঙ্গে? যদি আপনি হিন্দু হয়ে থাকেন, তাহলে এটা আপনি বিশ্বাস করবেন, এই জীবনটাই শেষ না, মৃত্যুর পরেও

জীবন চলতে থাকবে। কোন জিনিসটাকে নিয়ে যাবেন? আর যখন জন্ম নেবেন, এর পরের জন্মে আপনি কি চাইবেন? যেটাই চাইবেন, সেটা তো ম্যাজিক্যালি হয়ে যাবে না, ঠাকুরও ওটা করে দেবেন না। এখন থেকেই আপনাকে আস্তে আস্তে ওটাকে তৈরী করে যেতে হবে। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, ওনার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ উনি তবলা শিখতে আরম্ভ করে দিলেন। আমরা মজা করে বলতাম, ‘মহারাজ এই বয়সে আর তবলা শিখে কি হবে?’ উনিও মজা করে বলতেন, ‘পরের জন্মে কাজে লাগবে’। এই জন্মে আপনি কোনদিন তবলা বাজালেন না, আর মনে করছেন পরের জন্মে বিরাট তবলটি হয়ে যাবেন? কোন দিন হতে পারবেন না।

কিন্তু আমরা কিছুই করব না, কিছুই শিখব না; কারণ আমরা মনে করি, আমার যা বুদ্ধি আছে, আমার বুদ্ধির মত কি আর কারুর বুদ্ধি আছে? আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখলাম না যে বলবে, আমার বুদ্ধি কম। আর যদিও বলে, বুদ্ধি কম, সেটার মধ্যে বিনয় আছে, ওই বিনয়টা হল ব্যঙ্গ করা। কোন মানুষ মনে করে না যে, আমার গুরুজনদের থেকে আমার বুদ্ধি কম, সেইজন্য গুরুজনদের মানে না। পরে যখন সমস্যায় পড়ে, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বেরোয় তখন খুঁজে বেড়ায়, কে আমাকে একটা উপায় বলে দেবে, কে আমাকে একটা সঠিক পথ দেখাবে। মিলিটারিতে খুব সুন্দর বলে —যদি সারা জীবন ট্রেনিং নাও, লড়াইয়ের সময় কোন কষ্ট হবে না। ভারতবর্ষে সেই ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হয়েছিল, বেশির ভাগ সৈন্যদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই একই ট্রেনিং সব সময় চলছে, কারণ, যদি যুদ্ধ হয় তখন এই ট্রেনিংটা কাজে লাগবে। আমরা হলাম স্টেজে গিয়ে ম্যানেজ করে দেওয়ার পার্টি। কোন রিহার্সাল করব না, কোন অনুশীলন করব না, যা করব সব স্টেজে গিয়ে। এভাবে হয় না।

আচার্য এরপরে এটাই বলবেন, শাস্ত্র যখন অধ্যয়ন করা হয়, শাস্ত্র যখন বোঝার চেষ্টা করা হয়, তখন ধীরে ধীরে এই অধ্যাস জিনিসটা নরম হতে শুরু হয়। সেখান থেকে ঠাকুর বলছেন — অধিকাংশ লোক সংসার করতে পারে না। নিজের স্বভাবের নিয়ন্ত্রণ নেই, ছেলেমেয়েকে কি শেখাবে? বলছেন, **সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা হয়।** আপনি নিজের জীবনের দিকে তাকান, আপনার চারদিকে তাকান, দেখবেন চারিপাশে শুধু মৃত্যুযন্ত্রণা। করোনা যত না আমাদের মেরেছে, করোনার ভয় তার চেয়ে বেশি আমাদের মেরেছে —এটাকে বলে মৃত্যুযন্ত্রণা, ভয়েই আমরা মরছি। কেন ভয় হচ্ছে? একবারও কি মনে আসছে না যে, আপনি ঠাকুরের সন্তান। একবারও কি মনে হয় না যে, আপনি যদি মরে যান, আপনি আবার জন্ম নেবেন, জীবন এভাবেই চলতে থাকবে। মরে গেলে একটাই হয়, এই জীবন থেকে যে অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, করার ছিল, সেগুলো আর হবে না। আবার সুযোগ আসবে, আবার হবে। সেইজন্য মৃত্যুযন্ত্রণা পাওয়ার কোন কারণ নেই।

**কেউ কেউ, যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হলে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।** আজকে যদি সংসারে কষ্ট পান, আর তার জন্য যদি চোখ থেকে একটি জলের ফোঁটা বেরিয়ে থাকে, বুঝবেন সংসার ধর্ম আপনি ঠিক ভাবে করেননি। যার জন্যই হোক, মার জন্য হোক, বাবার জন্য হোক, গুরুর জন্য হোক, বন্ধুর জন্য হোক, নিজের জন্য হোক, খাওয়ার জন্য হোক, যেটার জন্যই হোক, সংসার ধর্ম আপনি ঠিক ভাবে পালন করেননি; তার থেকেও বেশি সাধন-ভজন আপনি করেননি। সাধন-ভজন যদি করতেন, চোখের জল বেরোত না। সাধন-ভজন করেছেন কিনা, তার একমাত্র পরীক্ষা — চোখে জল আসবে না।

কেশব সেনের শরীর খারাপ, ঠাকুর ঠনঠনে কালীবাড়িতে গিয়ে মানত করছেন। মাকে কি বলছেন? কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা বলব মা? এরপরে নরেন আদি ভাল কথা বলার অনেকেই এসে গেছেন। শেষে কেশবের আবার যখন শরীর খারাপ হল, তখন ঠাকুর বলছেন, আগের মত অতটা ছটফটানি হয়নি। মূল জিনিসটা হল এই সংসারে যে আমি আছি, এটা একটা ট্রেনে সফর করার মত। ট্রেনে ভাল সঙ্গী পেলে সময়টা ভাল কাটে, এ-ছাড়া আর কিছু না।



শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠিলেন। এই প্যারাগ্রাফের শেষে মাস্টারমশাই বলছেন, অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরীয় অনেক কথা হইতেছে। মুখে অন্য কথা কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথা। ঠাকুর সার্কাস দেখে বেরিয়ে এসেছেন, সার্কাস সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথা বলছেন না। আমরা যখন কোন কিছু দেখি, পরে সেটাকে নিয়ে অনেক সময় ধরে আমরা আলোচনা করতে থাকি। ঠাকুর জীবনে কোন দিন সার্কাস দেখেননি, সেদিনই প্রথম দেখলেন, এরপর আর কোন দিন দেখবেন না। একটা দুটো সার্কাস সম্বন্ধীয় কথা বললেন ঠিকই, যেমন বিবির কথা বললেন। কিন্তু ওর মধ্যেই যে ডুবে আছেন তা না; নেমে গেছেন ঈশ্বরীয় কথাতে।

সেখান থেকে জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠল। ঠাকুর বলিলেন, এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। এই জিনিসটাকে নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। দু-তিন পাতার পরে আবার এই নিয়ে কথা উঠবে। আমরা সংসার নিয়ে আলোচনা করছি, বিষয় থেকে সরে আসছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী বন্ধজীবের কথা বলিতেছেন। তারা যেন গুটিপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। আমরা যে এতক্ষণ ব্রহ্মসূত্র থেকে *যুসাদ্ অসাদ্ প্রত্যয়* নিয়ে লম্বা আলোচনা করলাম, এটা বলার জন্য – আপনি আর সংসার। দুটো বিপরীত ধর্মী, কোন দিন এক হতে পারে না। সেইজন্য আপনি চাইলেই আলাদা হয়ে যেতে পারেন, এটা অসম্ভব কিছু না; কিন্তু করবেন না। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে যে কথা বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ ভাষায় সেই একই কথা বলছেন। আসলে সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলে। যে কোন একটি শাস্ত্র যদি খুব ভাল করে মন দিয়ে পড়েন, বুঝতে পারবেন শাস্ত্র কি বলতে চাইছেন। গীতায় সেইজন্য বলছেন, *বহুশাখা হনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্*, যারা অব্যবসায়ী তাদের বুদ্ধি অনেক কিছুতে দৌড়াচ্ছে।

বলছেন, কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না, তাতেই মৃত্যু হয়। এত ভালবেসে গুটি তৈরী করেছে, কি করে ছাড়বে! আবার যেন ঘুনির মধ্যে মাছ; যে-পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। ভাগবতে একটা বর্ণনা আছে, মাছ যখন ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে যায়, ওই যে জলের মিষ্টি আওয়াজ, ওর মধ্য থেকে আর বেরিয়ে আসতে চায় না, ওর মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে মরে যায়। এখানেও ঠাকুর বর্ণনা করছেন, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না; ছেলেমেয়ের আধ-আধ কথাবার্তা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ। বাড়িতে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থাকে, বাড়িকে ওরাই যেন মাতিয়ে রাখে, আধো-আধো কথা বলছে, শুনতে এত মিষ্টি লাগে যে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিজের ছোট সন্তান বা নাতির এই মিষ্টি কথাবার্তা, দুষ্টুমি এত মিষ্টি যে শুধু নিজের ভিতরে ধরে রাখা যায় না, বন্ধুবান্ধব, অফিসে সবাইকে শেয়ার করার জন্য বলা চাই। আমাদেরকেও এসে বলে, জানেন মহারাজ, আমার নাতি আজ এই করেছে, সেই করেছে। তবে দু-একটা দৌড়ে পালায়, তাদের বলে মুক্তজীব।

ঠাকুর আবার একটা উপমা নিয়ে আসছেন, জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। কি করে বুঝব আমি সেই ডাল হয়ে আছি কিনা? চোখের জলে বোঝা যাবে, তাছাড়া আর কিছু না। অনেক কষ্ট পাচ্ছেন কি, ঈশ্বরের নাম করা বাদে চোখের জল কি কখন বেরিয়েছে? ঈশ্বরের নামে চোখের জল যদি বেরিয়ে আসে, সেটা আলাদা জিনিস। যদি এগুলো হতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, জাঁতাকলে পড়ে আছেন। ঠাকুর সংসারকে কিভাবে দেখছেন – খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। আর সংসার থেকে বেরিয়ে আসা যে কত জরুরী; সংসার থেকে বেরিয়ে আসা মানে ঘর-বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া না, সাধন-ভজন করলে একটা অনাসক্তের ভাব জাগে, তখন একটু দূরে সরে যায়। দূরে সরে গেলে কি হয়, আনন্দটা একটু কমে যায় ঠিকই, কিন্তু কষ্টটা কমে যায়। ঠাকুর বেরিয়ে আসা নিয়ে বলছেন – চাইলে সে বেরিয়ে আসতে পারে।

ভক্তদের মধ্যে বিশ্বাসবাবু বলে একজন ছিলেন। বর্ণনা করছেন, বিশ্বাসবাবু অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন, এখন উঠিয়া গেলেন। তাঁহার অনেক টাকা ছিল, কিন্তু চরিত্র মলিন হওয়াতে সমস্ত উড়িয়া গিয়েছে। এখন পরিবার, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও দেখেন না। বলরাম তাঁহার কথা পাড়াতে ঠাকুর বলিলেন “ওটা লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রি”। এখানে লক্ষণীয় হল, ঠাকুর বলছেন, ‘ওটা লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রি’।

তার মানে দারিদ্রতা দুই প্রকার – একটা লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রি, আরেকটা দারিদ্রে লক্ষ্মী আছেন। এই কথা বলার পর ঠাকুর বলছেন – গৃহস্থের কর্তব্য আছে, ঋণ আছে, দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ আবার পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে। সতী স্ত্রী হলে তাকে প্রতিপালন, সন্তানদিগকে প্রতিপালন যতদিন না লাগে হয়।

সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। ‘পঙ্খি আউর দরবেশ’ সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখির ছানা হলে সঞ্চয় করে, ছানার জন্য মুখের করে খাবার নিয়ে যায়।

ঠাকুর এখানে দুটি কথা বলছেন, এই দুটো কথাতে আমাদের বোঝা দরকার। প্রথম কথা হল ‘লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রি’। আর দ্বিতীয় কথা হল – ঋণের ব্যাপার, যেখানে গৃহস্থের কর্তব্য আছে, তার কথা ঠাকুর বলছেন। এটা বোঝার যে, ঠাকুর হঠাৎ কেন এই কথা বললেন? অনেক সময় আপনাদের মনে হবে আমি একটু বেশি ব্যাখ্যা করছি। অবশ্যই বেশি ব্যাখ্যা আমি করি, কারণ ব্যাখ্যা যখন করতে বসেছি, তখন আমাকে দেখাতে হবে হিন্দু ধর্ম থেকে কিভাবে ঠাকুরের এই ভাবগুলি এসেছে। অন্যান্য ধর্মে কি হয়, যাঁরাই তাঁদের ধর্মগুরু ছিলেন, তাঁরা যে কথাগুলো বলে গেছেন, আমরা জানি না, তাঁরা ওই কথাগুলো কেন বললেন। অনেক ধর্মগুরু বলেন, ভগবানের আদেশে তাঁরা কথাগুলো বলেছেন। অনেক সময় তাঁদের সমাজ ছিল, সেই সমাজে লোকেরা যে কথাগুলো মানতেন, সেটাকে আধার করে বলেছেন। কিছু কথা আবার তাঁরা যে সমাজে ছিলেন, সেই সমাজের মনের মত করে বলেছিলেন। এগুলোকে বোঝা খুব মুশকিল, হিন্দুদের সেটা হয় না। একমাত্র হিন্দু ধর্ম, যেখানে ধর্মের যে আদেশ, কারু কথা মত চলে না, প্রত্যেক আদেশের পিছনে একটি সিদ্ধান্ত থাকে। এই যে দুটি কথা, ‘লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রি’ আর তার সঙ্গে যে ঋণের কথা বলছেন, এই দুটো কথার যে পশ্চাৎপট, সেটাকেই আমি একটু ব্যাখ্যা করছি। সিদ্ধান্তগুলো বুঝে রাখলে মানুষ ভুল করে না। এমনি যখন বলে দেওয়া হল, এই জিনিসটা করবে না, ঠিক আছে। আমাদের অনেক সময় বলে, একটু বলে দিন না, কি করব। আমরা কেন আপনাকে কোন কিছু বলতে যাব? আমরা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করে দিই। গীতাতে ভগবানকে যখন অর্জুন বলে দিলেন তিনি যুদ্ধ করবেন না; ভগবান তখন এটাই করলেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি কেবল সিদ্ধান্তগুলি দিয়ে গেলেন। শেষ বলে দিলেন – আমি যা বলার বললাম, এবার তুমি যা ঠিক মনে কর তাই কর। আমাদের দেখতে হবে, ঠাকুরের এই দুটি কথার পিছনে কি সিদ্ধান্ত।

বেদ-উপনিষদ সরাসরি বুঝতে গেলে অনেক অসুবিধা হবে। কারণ বেদে মূলতঃ রয়েছে দেবতাদের প্রতি প্রার্থনাগুলি আর উপনিষদে রয়েছে আত্মতত্ত্ব। এই দুটোকে খুব সুন্দর ভাবে গুছিয়ে মহাভারতে নিয়ে আসা হয়েছে। মহাভারতেও পুরোপুরি আসে না, পরে যে গ্রন্থগুলো এসেছে, যেগুলোকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়, যার মধ্যে মনুস্মৃতি আদি রয়েছে, মহাভারত নিজেই রয়েছে; সেখানে পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে বলা হয়েছে। আমি সেইজন্য ইংরাজীতে ‘The Hindu Way’ আর বাংলায় ‘হিন্দু জীবনধর্ম’ বইতে পুরো জিনিসটাকে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রেখে দিয়েছি, লোকদের যাতে হিন্দু ধর্মের মূল জিনিসগুলিকে বুঝতে অসুবিধা না হয় – হিন্দু ধর্ম বলতে এই।

হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রে বারবার একটা জিনিসকে নিয়ে আসা হয়েছে, তা হল – প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, গৃহস্থের ধর্ম ও সন্ন্যাসীর ধর্ম। গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলছেন, *দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ*, বেদের ধর্ম দুই প্রকার, *প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ*। প্রবৃত্তিলক্ষণ হল যেখানে আপনি

কিছু করতে নেমে যাচ্ছেন আর নিবৃত্তিলক্ষণ হল, যেখানে আপনি বেরিয়ে আসছেন। ছেড়ে দেওয়াকে নিবৃত্তি বলা হয়, আর লেগে থাকাকে প্রবৃত্তি বলা হয়। আচার্য বলছেন, হিন্দু ধর্মে পরিষ্কার ভাবে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সব ধর্মেই তাই আছে, যখন ধর্ম বলছে এটা করবে, ওটা করবে—এটাই প্রবৃত্তি। নিবৃত্তির ভাব অন্যান্য ধর্মে অন্য ভাবে আছে। বিশেষ করে আমরা বাইবেল আদি ধর্মগ্রন্থে দেখি, যেখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বরের জন্য সব ছেড়ে দাও, ঈশ্বরকে ভালবাস। হিন্দু ধর্ম এটাকেই অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, গীতা, উপনিষদে ও হিন্দুদের অন্যান্য যে ধর্মগ্রন্থ আছে সেখানে পরিষ্কার করে এর ব্যাখ্যা করেছেন। কথামতে এই নিবৃত্তিমার্গ পদে পদে আছে। যতবারই ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, আসলে এগুলো নিবৃত্তিমার্গের কথা। আর প্রবৃত্তিমার্গের কথা—গৃহস্থদের কি করতে হবে, সংসারে কিভাবে থাকতে হয়, এই ধরণের কথা কথামতে একটু কম। কিন্তু যেখানে যেখানে রয়েছে, সেখানে ঠাকুর কেবল সিদ্ধান্তগুলি বলে যাচ্ছেন, লোকেরা যাতে বুঝে নিতে পারে। দ্বিতীয় কথা হল, ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন সংসারী। তাঁরা মোটামুটি সংসারীদের কর্তব্য অকর্তব্য জানেন, জানা জিনিসকে জানিয়ে তো কোন লাভ হয় না, যেটা অজানা সেটাকেই বলতে হয়।

প্রবৃত্তিমার্গে তিনটে জিনিসের কথা বলা হয়েছে—ধর্ম, অর্থ আর কাম। নিবৃত্তিমার্গের মূল হল—মোক্ষ। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, যাদের প্রবৃত্তিমার্গের দিকে যাওয়ার কথা, অর্থাৎ যাঁরা গৃহস্থ ধর্মে আছেন, তাঁরা নিয়ে নিলেন সন্ন্যাসীর ধর্ম—নিবৃত্তিমার্গ। এখন একটু পাল্টেছে, কিন্তু আগেকার দিনে গ্রামগঞ্জে দেখা যেত গৃহস্থরা সাধু-সন্ন্যাসীদের মত থাকতেন। অন্য দিকে সন্ন্যাসীদের, যাঁদের নিবৃত্তি মার্গের পথ, আগেকার দিনে দেখা যেত, কি ভাবে সম্পত্তির বৃদ্ধি করা যায়, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি। আর ইদানিং টিভি, সোস্যাল মিডিয়ায় যেসব বাবাজীদের দেখা যায়, তাদের তো এক-একজনের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। পুরো রামকৃষ্ণ মিশনের যত সম্পত্তি, আর যে সম্পত্তি মানবসেবার কাজের জন্য; তার থেকে বেশি এক একজন বাবাজীর সম্পত্তি আছে। যাদের ত্যাগ করার কথা, তারা করছে সঞ্চয়; যাদের সঞ্চয় করার কথা, তার নিচ্ছে ত্যাগের ধর্ম।

ধর্ম, অর্থ ও কাম, এর মধ্যে অর্থ জিনিসটা হিন্দুদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ যদি না থাকে তাহলে তুমি ধর্ম; ধর্ম মানে যজ্ঞাদি ধর্ম, তীর্থাদি ধর্ম, আর তার সাথে গৃহস্থদের জন্য যে কিছু ধর্মগুলি রয়েছে, এর কোনটাই পালন করতে পারবে না। তবে হিন্দুরা যারা সংসারে আছেন তাদের মধ্যে কিছু লোকের জন্য ছাড় দিয়ে রেখেছিলেন। তার মধ্যে একজন হল ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের বলে দেওয়া হল—তোমরা বিদ্যার প্রতি সমর্পিত থাকবে আর যতটুকু হলে জীবন চলে যাবে, ততটুকুই তুমি নেবে। দ্বিতীয় যেটা ছাড় দিয়ে রেখেছিলেন, সেটা হল বিধবাদের জন্য ছাড়। আমরা বিধবার সমস্যাতে ঢুকব না। রাজা রামমোহন রায়ের সতিদাহ প্রথা, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ, এগুলোতে আমরা যাচ্ছি না।

ঠাকুরের জীবনীতে আমরা পাই, ঠাকুর এক জায়গায় ভক্তি কেমন হবে বলতে গিয়ে বলছেন—পরের জন্মে বিধবা হয়ে জন্ম নেব, একটু জমি থাকবে, তাতে একটু শাক বুনব, তাই দিয়ে জীবনটা চালাব আর সারাটা দিন ঠাকুরের নাম করব। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ধর্মই হিন্দুদের আদর্শ। আমরা একটা খুব উচ্চ আদর্শে যাচ্ছি, যে আদর্শ হাজার দু-হাজার বছর আগে ছিল। স্বামীজী ওই আদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন—দেখ আমাদের এখানে ছেলে কম, তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এখন সেটা কোন কারণে হল না, তুমি এখন ভুলে যাও; ভুলে গিয়ে এবার তুমি ঈশ্বরের দিকে মন দাও। ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটো জিনিস হয়ে যায়। একটা হল, ধর্ম শব্দ দিয়ে, যেটা আমাদের মোক্ষশাস্ত্রে বলছেন। দ্বিতীয় মোক্ষ পথে, যেখানে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে মোক্ষ পথে চলে যান।

তার মানে ধর্ম পথ হল যেখানে প্রবৃত্তি রয়েছে। আর মোক্ষ পথে মানে, যেখানে নিবৃত্তি রয়েছে। মানুষ যখন সংসারে আছে, তখন তার কাছে অল্প-বিস্তর টাকা থাকবে, কারুর কম, কারুর বেশি টাকা থাকবে। সেই জায়গাতে যে অভাব, যেটাকে দারিদ্রতা বলা হয়; সেটা তখন দুই প্রকার হয়ে যায়। প্রথম দারিদ্রতা হল, যে দারিদ্রতাকে আপনি নিজে গ্রহণ করেছেন। খ্রীশ্চনদের মধ্যে যাঁরা ফাদার হন, তাঁদের তিনটে জিনিসের ব্রত নিতে হয় – টাকা-পয়সা সঞ্চয় করব না, কোন ধরণের মৈথুনে যাব না, আর শেষ শপথ হল, চার্চের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব, মানে চার্চের কাছে মাথাটা নত থাকবে। আমাদের এখান ব্রত নেন না, আমাদের এখানে এটা হল way of life, এটাই আমাদের জীবনধারা। ব্রত মানে হয়, আমি চেষ্টা করছি, কখন সফল হলাম আবার কখন হয়ত পতন হয়ে গেল। আমাদের কাছে তা না। এটাই তোমাকে করতে হবে, পড়ে-টড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই।

মা যেমন ছোট্ট সন্তানকে ভালবাসে, তার জন্য এটাই তার way of life। একমাত্র কোন মা মন্দিরে গিয়ে অগ্নি দেবতাকে সাক্ষী রেখে বলে না যে, আমি দিব্যি খাচ্ছি, আমার নবজাত শিশুকে আমি দুধ খাওয়াব, তাকে আমি দেখাশোনা করব –এই ধরণের কথা কখনই কোন মা বলে না। মা জানে, এটাই আমার জীবন, এটাই আমি করব। যে জায়গায়টা হবে না, যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন ছেলে ও মেয়ের যখন বিয়ে হয়, তখন তারা অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করে। কারণ জানে সাক্ষী না রেখে করলে, এ ওদিকে পালাবে সে ওই দিকে পালাবে। চার্চে যে বিয়েগুলো হয়, সেখানে দেখবেন খ্রীশ্চান ফাদাররা যাদের বিয়ে হচ্ছে তাদের বলতে বলবে, ‘আই ডু’, ‘আই ডু’, আসলে I wount’ do। সেইজন্য আই ডু আই ডু বলে দিব্যি খাইয়ে তাকে বেঁধে রাখছে। হিন্দুদেরও তাই, মন্দিরে কোন দেবতার সামনে বা অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। মা তো কখন এ-রকম কোন কিছু করে না, কারণ ওটাই তার way of life। ঠিক তেমনি যাঁরা ধর্ম পথে যান, তাঁদের জন্য এটা way of life হয়ে যায়। আর এই যে দারিদ্র, তার মানে আমি কিছু ধরে রাখব না, আর কোন কিছু পালটা আমাকে ধরে রাখবে না, এটাই তাদের way of life হয়ে যায়।

এটাই যখন way of life হয়ে যায়, যেখানে আমি সব ছেড়ে দিয়েছি, আমি সঞ্চয় করব না – এটা হল স্বভাবে দারিদ্র; আর যেখানে আমি চাইছি, পাওয়ার জন্য আমার মন ছটফট করছে, যেমন বলবে, আমার টাকা চাই। এটা হয়ে যায় অভাবে দারিদ্র। এই স্বভাবের দারিদ্র আর অভাবের দারিদ্র এই দুটোর বাইরে তৃতীয় আরেকটা দারিদ্র হয়, যেখানে চরিত্র মলিন, আপনি কিছু দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। একজন লোক যার টাকা-পয়সা আছে, পৈতৃক হোক বা নিজের হোক, সে একটা দায়িত্ব নিয়েছে বা কথা দিয়েছে যে, আমি আমার স্ত্রীর প্রতিপালন করব, সন্তানের প্রতিপালন করব। সমাজ তার কাছে এটা আশা করে। সেখানে সেই লোক কি করল? নিজের চরিত্রের দোষে জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, কোন নারীর পিছনে দৌড়ে সব টাকা উড়িয়ে দিল। এখন তার যে পরিস্থিতি, এটা স্বভবেও দারিদ্র নয়, অভাবেও দারিদ্র নয় –এটাই লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্র, যেটা ঠাকুর বলছেন।

আগেকার দিনের যে ব্রাহ্মণরা ছিলেন, তাঁরা বেশি টাকা-পয়সা চাইতেন না। চাইলেও অনেক সময় পেতেন না, কিন্তু তাতেও তাঁদের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকত। আপনাদের যাঁদের বয়স হয়েছে, দেখবেন আপনারা যখন ইয়ং ছিলেন, আপনাদের আশেপাশে ব্রাহ্মণ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে বেশি টাকা-পয়সা থাকত না। কিন্তু তাতেও তাঁদের মধ্যে একটা সন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হত। তাঁদের একটা ঐশ্বর্য ছিল, এই ঐশ্বর্যটা হল –শাস্ত্রজ্ঞানের ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরভক্তির ঐশ্বর্য।

ঐশ্বর্যবিহীন মানুষ, এরা হল এই পৃথিবীত ভারস্বরূপ মানুষ। ঐশ্বর্য শব্দটা এসেছে ‘শ্রী’ শব্দ থেকে, শ্রী মানে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কোন না কোন রূপে যাঁর উপর কৃপা করছেন না, সেই মানুষ হতচ্ছাড়া, এই পৃথিবীতে সে ভারস্বরূপ। ঐশ্বর্য অনেক রকমের হয়। ঠাকুর অন্য একটা জায়গায় বলবেন –জ্ঞান

ভক্তির ঐশ্বর্য। এখন এই জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন করতে গিয়ে আপনাকে যদি দুটো জিনিস ছাড়তে হয়, তাতে কোন দোষ নেই। এখানে বিশ্বাসবাবুর যে কথা চলছে, তার কোন ঐশ্বর্য নেই। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে নেই, ধর্মজীবনেও তিনি নেই, শাস্ত্র পড়াশোনাটাও নেই, কোন কিছুই নেই। এটা হল শ্রী বিহীন, বাংলায় যাকে বলে বিশ্রী। আমরা নামের আগে শ্রী বা শ্রীমান দিয়ে থাকি। ছেলেদের ক্ষেত্রে শ্রীমান আর মেয়েদের ক্ষেত্রে নামের আগে শ্রীমতি বলা হয়। শ্রীমান বা শ্রীমতি বলার মানে হল এর মধ্যে শ্রী রয়েছে। কিন্তু যার মধ্যে শ্রী নেই, তার মানে –জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য, টাকা-পয়সার ঐশ্বর্য, এগুলোর কোনটাই নেই।

এখন আপনারা বলতে পারেন, টাকা-পয়সা ঐশ্বর্য তো ভাল জিনিস না। এটা যে ভালো জিনিস না সবাই জানে। টাকা-পয়সা হলে মদ হয়, অহঙ্কার হয়, অপরের ক্ষতি করার প্রবণতা হয়; আমরা সেটাকে এখানে আলোচন করছি না। এখান বলা হচ্ছে, তোমার কোন ঐশ্বর্য আছে কি নেই? তুমি যে দারিদ্রে প্রতিষ্ঠিত বা অভাবে প্রতিষ্ঠিত, এটা কি তোমার by compulsion, নাকি এটা তোমার by option? আমি নিজের কথা বলছি, আমি যখনই কাউকে দেখি by compulsion অপদার্থ, আমার কেন জানি না তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এই বিশ্বাসবাবুর কথা ঠাকুর যেটা বলছেন, লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রির, আমার তখন মনে হয় একেবারে ঠিক, এই ধরণের লোকের সঙ্গ করা আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে যায়। কারণ আমি বুঝছি এর ভিতরে সার পদার্থ কিছু নেই। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, যাদের ভিতর সার থাকে না, এদের দিয়ে কিছু হয় না, নিজেদেরও কিছু হয় না। এরা শুধু শ্রী-বিহীন না, এরা হল সারবিহীন মানুষ। এদের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কোনটাই হবে না। জন্মজন্মান্তর ধরে এরা দুর্ভাগ্যের চক্রে পড়ে পড়ে কবে কখন যদি ভাল মানুষের সঙ্গ পেয়ে যায়, কোন অবতার বা মহাত্মার কৃপা যদি পেয়ে যায়, তখন যদি মনটা একটু শুভ কাজের দিকে যায়।

এখানে চারিত্রিক দোষ বলছেন, চারিত্রিক দোষ মানে, ধর্ম যা করতে নিষেধ করে সেটাই নিষিদ্ধ কর্ম, কিন্তু আমরা যেটা নিষিদ্ধ কর্ম সেটাকে নেমে যাই, আর যেটা বিধি, শাস্ত্র যেটা করতে বলে, সেটার দিকে মন যায় না। আক্ষরিক অর্থে এটাই চারিত্রিক দোষ; বুঝতে হবে যে, এবার আপনার শ্রীকে আস্তে আস্তে টেনে নেবে। ঠাকুর অনেক জায়গায় বর্ণনা করছেন – হারুক্রে প্রেতনী পেয়েছে। দেখা যায়, এদের শ্রীটা আস্তে আস্তে নাশ হয়ে যাচ্ছে।

এই যে আলোচনা চলছে, এখানে এর থেকে একটি কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে – তা হল নিজের যে শ্রী এটাকে রক্ষা করুন। শ্রীকে প্রথমে রক্ষা, দ্বিতীয় কিভাবে শ্রীবৃদ্ধি করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। শ্রী যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, শ্রী বিদ্যার ক্ষেত্রেই হোক, ধর্মেই হোক; এই শ্রী-কে রক্ষা ও বৃদ্ধি দুটোই করতে হবে। কারণ, তখন কি হয়, একটা দিকে যদি আপনার শ্রী এসে যায়, তখন আপনি চাইলে এটাকে অন্য দিকেও নিয়ে যেতে পারেন।

একটা খুব মজার ঘটনা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। কেরল রাজ্যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটা সেন্টার আছে। অনেক আগেকার কথা, ওখানকার এক সেন্টারে আমাদের যিনি অধ্যক্ষ মহারাজ ছিলেন, ওনাকে সমাজের সবাই খুব সম্মান করতেন। আশ্রমের কাছে ফিলিপস বা অন্য কোন কোম্পানির একটা বড় অফিস ছিল। অফিসের যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন, তিনি এই মহারাজের বিরাট ভক্ত। মাঝেসাঝে সেন্টারে মহারাজের কাছে আসতেন, প্রণাম করতেন, খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। একদিন মহারাজ বাবু কোম্পানির অফিসে গিয়ে বলছেন, ‘আমাদের অফিসের একটা বাবু ফিউজ হয়ে গেছে, একটা বাল্ব দান করুন’। রামকৃষ্ণ মিশনের সবটাই দানে চলে কিনা। এখন মানুষের টাকা-পয়সা হয়েছে, ভক্তরা এখন অর্থ দান করেন, আগেকার দিনে মানুষের এত টাকা-পয়সা ছিল না, সেইজন্য জিনিস-পত্র দান করতেন।

অত বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, উনি হেসে ওনার এ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে এক কার্টুন বালব্ মহারাজকে দিলেন—‘স্বামীজী এটা নিয়ে যান’। মহারাজ দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন, বলতে লাগলেন— ‘না না আমার মাত্র একটি বালব্ লাগবে, আমাকে একটি বালব্ দিন, আমি এই কার্টুন নিয়ে কি করব, আমি নিতে পারব না’। ডিরেক্টর ভদ্রলোক বলছেন, ‘কদিন পর আবার একটা বালব্ ফিউজ হবে, তখন তো আবার দরকার পড়বে’। মহারাজও ছাড়বার না, উনি তখন খুব জোর দিয়ে বললেন — ‘I need one bulb, please give me one’। শেষ পর্যন্ত তাই হল, বাস্তব খুলে একটি বালব্ নিয়ে, একটু গল্প করে, চা খেয়ে চলে এলেন। আমার এতটুকু দরকার, অতটুকুর বেশি আমি নেব না।

আমাদের এক মহারাজ বলতেন, We are beggars, but we are not ordinary beggars, we are royal beggars। ভগবান বুদ্ধ তিনি রাখায় রাখায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষা করছেন, তিনি রয়েল বেগার, তিনি অভাবে ভিখারী না, স্বভাবে। যাঁরা স্বভাবে দান করছেন, তাঁরা বদলে একটা শ্রী পেয়ে যান, আর এই শ্রীটা পরিষ্কার তাঁর মুখের উপর দেখা যায়। ঠাকুরের বর্ণনা আছে, কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁর ভিতরটা পুরো দেখতে পারতেন। আমি আপনি অন্যের ভিতরটা দেখতে পারব না, কিন্তু মুখটা দেখতে পারব। অনেককেই এই কথা বলতে দেখা যায় — ওর মুখে শ্রী নেই। আবার অনেকের মুখটা জ্বল জ্বল করে, এটা কেন হয়? যদি আপনার শ্রী থাকে। ঠিক ঠিক যদি শ্রী থাকে, মনটা যদি পরিষ্কার থাকে, তখন তার চেহারার উপর একটা ঔজ্জ্বল্য ভাব থাকবেই। এরজন্য যে আপনাকে বিরাট কিছু করতে হবে, তা না, মনটা একটু শান্ত হলেই দেখতে পাবেন কার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য আছে, কার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য নেই।

ইদানিং কালে সমাজে একটা নূতন জিনিস দেখা যাচ্ছে, আগে ছিল না, পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনে দেখবেন লেখা থাকে, ফর্সা পাত্রী, গৌরবর্ণ পাত্রী চাই। সবাই ফর্সা মেয়ে খোঁজে। এটাকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছে, যেখানে বলছে, যারা এই ধরণের বিজ্ঞাপন দেয় বা বলে, এরা নিন্দার পাত্র। সত্যি সত্যিই নিন্দার পাত্র। আমরা এটা ভুলে যাই, আমাদের অনেকেই যাঁরা আরাধ্য, পূজনীয়, তাঁরা বেশির ভাগই শ্যামবর্ণ ছিলেন — শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এনারা কেউ ফর্সা ছিলেন না। আর দ্রৌপদী যে সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন, যার জন্য সেই সময় তাঁকে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী বলে মনে করা হত, তিনি শ্যামবর্ণা ছিলেন।

কোথায় আমরা ভুল করছি? আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য লিখতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, কারুর চেহারা চামড়ার রঙ দিয়ে বিচার করা যায় না, এটাকে আচার্য বলছেন — *প্রাগলভম্*, চেহারাটা ঝকঝক কি না, ঔজ্জ্বল্য আছে কি না। শুধু চামড়ার রঙ ফর্সা হলে হয় না, দেখতে হয় শ্রী আছে কি না। একটা শব্দ আছে — ভ্যাদভ্যাদে; ভ্যাদভ্যাদে মানে কেমন জৌলুষবিহীন। আপনি গৌরবর্ণ কি শ্যামবর্ণ এটা গুরুত্ব না, আপনি বেঁটে কি লম্বা গুরুত্ব না, গুরুত্ব হল চেহারায় আপনার শ্রী আছে কি না। শ্রী আসে সাত্ত্বিক ভাব থাকে, যেটা আগেকার দিনে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের থাকত, সন্ন্যাসীদের থাকে, ব্রহ্মচারীদের থাকে আর যারাই সত্যিকারের একজন ভাল মানুষ, তাঁদের চেহারায় একটা শ্রী থাকে। চেহারাতেই বোঝা যায়, তার টাকা থাকুক আর নাই থাকুক, তার শ্রী আছে কি না, সে একজন সত্যিকারের ভাল মানুষ কি না। ঠাকুর কয়েকবার এই জিনিসটাকে বর্ণনা করছেন, এক জায়গায় বলছেন, মল্লিকদের বাড়িতে দেখলাম সিংহবাহিনীর মূর্তি জ্বলজ্বল করছে। যেখানে লোকেদের মধ্যে ভক্তিভাব আছে, সেখানে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁরও মুখ জ্বলজ্বল করবে। এটা এমন কিছু না, প্রথম কথা সাত্ত্বিক ভাব যেটা বলা হল, তার সঙ্গে যদি শ্রী অর্জন করা হয়, তাহলে চেহারা ঝকঝক করবে।

সংসারীদের অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। কারণ সংসারে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়, দায়িত্ব পালন করার জন্য টাকা-পয়সা আয় করতে হবে, সংসারে টাকা-পয়সা থাকতে হবে। সংসারীদের ওই টাকা দিয়েই সমাজ চলে, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের দেখাশোনা করা।

আজকে যে ভারতের দুরবস্থা, তার একটা প্রধান কারণ হল, আমরা শিক্ষাকে ব্যবসায় পাণ্টে দিয়েছি। যে কোন সমাজ বড় হয় ত্যাগের উপরে। ছাত্ররা হল দেশ ও সমাজের ভবিষ্যত, সেই ভবিষ্যতকে আমরা যখন তৈরী করছি, এটা যেন চারা রোপণ করা হল। চারা রোপণ করার পর তাকে অনেক কিছু দিতে হয়, জল, সার, রোদ, বাতাস ইত্যাদি। এগুলো না পেলে চারা বড় বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে পারবে না। আমাদের ভবিষ্যত হল এই ইয়ং প্রজন্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেখুন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সবাই আজকে শিক্ষাকে নিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এই ব্যবসা করে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে—বাচ্চারা দেখছে আমার বাবা-মায়েরা কত কষ্ট করে কত টাকা ঢালছে আমাকে বড় করার জন্য। আমি ইন্দোরের আইআইএমে যেতাম, সেখানে পাঁচ বছর ধরে আমি একটা মডেল পড়াতাম, তার এক বছরের fees ষোল লক্ষ টাকা। যারা ওখানে পড়াশোনা করছে, তাদের বেশির ভাগ ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েই পড়ছে। যে ছেলে ওখান থেকে পাশ করে বেরোবে, তার দুশ্চিন্তা থাকবে টাকাটা কিভাবে শোধ করবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সব জায়গায় একই অবস্থা। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নিতেন, আর গৃহস্থরা দায়িত্ব নিতেন শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর পরা, থাকা, খাওয়ার। শিষ্যরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা বা চাঁদা সংগ্রহে যেত, সেটা দিয়ে তাদের সংস্থান চলত। যাই হোক ওই ব্যবস্থা এখন পাণ্টে গেছে, যে ব্যবস্থা পাণ্টে গেছে সেটা তো আর ফেরত আসবে না। কিন্তু একজন গৃহস্থের যেটা দায়িত্ব, সে যে অর্থ অর্জন করবে, সেই অর্থ অর্জন করে সন্ন্যাসী, যাঁরা ত্যাগী, তাঁদের যে খরচ, সেই খরচের বেশির ভাগটাই সেই অর্জিত অর্থ দিয়ে চালানো হত। সরকারকে লোকেরা যদি ইনকাম ট্যাক্স না দেয়, সরকার চলতে পারবে না। করোনার সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে ট্যাক্স কালেকশান কমে গিয়েছিল। একটা দুটো রাজ্য বলছে, আমরা কর্মচারীদের মাইনে দিতে পারব না। সরকার বলছে খরচ কমাতে হবে। কারণ সরকার, সমাজ দাঁড়িয়ে আছে গৃহস্থের উপরে।

আমরা বিভিন্ন ক্লাশে পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর প্রচুর আলোচনা করেছি। এখন খুব সংক্ষেপে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিয়ে বলছি। বিভিন্ন ধর্মে কিছু কিছু জিনিস পালন করতে হয়, ইসলামে কয়েকটা জিনিস বলা আছে, যেমন দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তে হবে, রমজানে রোজা রাখতে হবে, রোজাতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে কোন কিছু খাবে না, এই ধরণের কিছু কথা বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম পঞ্চ ঋণের কথা বলেন, যেটাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হয়। এই যে আমার শরীর মন, আমার যে আস্তিত্ব আজকে দাঁড়িয়ে আছে, এর পিছনে অনেকের অবদান আছে। আমি খাওয়া-দাওয়া করছি, ভাত-ডাল খাচ্ছি, এই খাওয়া-দাওয়া করতে গিয়ে অনেক জীবজন্তু মারা যাচ্ছে। যারা মাছ, মাংস খায়, সেখানে অনেক প্রাণহানি হচ্ছে। সমাজে যখন আছি, সমাজের লোকেরা আমাদের নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। কারণ, চোর, ডাকাত, ঠকবাজ, মস্তান লোকেরা কত রকমের ঝামেলা তৈরী করে। বাবা-মা আমাদের এই শরীর দিয়েছেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের জেনেটিক পুল দিয়ে আমাদের এই শরীর দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতিতে যে রোদ, বৃষ্টি, ঋতুর আগমন, এগুলোর পিছনে যে দৈবী শক্তি, অর্থাৎ দেবতাদের শক্তি সব কিছু ঠিক সময়ে আসে যায়। এগুলোকে বলে আধিদৈবীক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। এই যে করোনার ঝামেলা চলছিল, তার মানে কোথাও একটা আধিভৌতিক সমস্যা এসে গিয়েছিল। এটাকে দাবানোর জন্য যেমন একটু ওষুধ-পত্রের দরকার, ঠিক তেমনি একটু দৈবী শক্তিরও দরকার। বর্তমান কালের যুক্তিবাদীরা এগুলো মানবেন না। কিন্তু আমাদের জীবনটা চলে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আর ভাল-মন্দ সব কিছুতে আমরা তাঁকেই দেখি। ভাল যেটা আসছে আমরা জানি সেটাও তাঁর কাছ থেকে আসছে, মন্দ যা কিছু আসছে, সেটাও তাঁর কাছ থেকে আসছে। কেন আসে, সেটা আমরা জানি না। যেটা আমরা নিতে পারি না, তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, ঠাকুর রক্ষা কর।

তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস থাকে, সেটা হল সংস্কৃতি। আমরা হিন্দু, এই ভাবটা; যারা মুসলমান তার বলে আমরা মুসলিম, যারা খ্রীস্টান তারা বলে আমরা খ্রীস্টান। এই জিনিসটা আসে যাঁরা সংস্কৃতিবান ছিলেন, তাঁদের থেকে, আমরা তাঁদেরকে বলি ঋষি। সবারই প্রতি আমাদের একটা ঋণ

আছে, বলা হয় আমাদের পাঁচটি ঋণ। সবার উপরে বলা হয় ঋষি-ঋণ। ঋষিরা আমাদের সংস্কৃতি দিয়েছেন, সেটাকে শোধ করার জন্য আমাদের নিত্য জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ করতে হয়। কিছু না হোক প্রতিদিন অন্তত এক ঘন্টা আমাদের জপধ্যান ও শাস্ত্রপাঠে লেগে থাকতে হবে, এটাকে দিনে দু-বার, তিন-বারে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা এটাকে আর ঋষিযজ্ঞ বলেন না, অনেক সময় এটাকে বলেন ব্রহ্মযজ্ঞ, তাঁরা নিজেদের পুরোপুরি এটাতেই দিয়ে দিয়েছেন। দেব-ঋণ শোধ হয় নিত্য পূজা করে। যাঁদের বাড়িতে পূজা আদি হয়, সেখানে পঞ্চ দেবতার পূজা করতে দেখা যায়। তার সঙ্গে আশেপাশে যে মন্দিরগুলো আছে, সেই মন্দিরগুলিতে যাওয়া, গঙ্গামান করা, কিছু কিছু রিচুয়ালস্ পালন করা, এটা হল দেব-ঋণ। ব্রাহ্মণরা পুরোপুরি নিজেদের পূজা আদিতেই দিয়ে দিয়েছেন। বাবা-মার প্রতি কর্তব্য, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের প্রতি কর্তব্য, যার জন্য শ্রাদ্ধকর্ম, পিণ্ডদান এগুলো করতে বলা হয়, খাওয়ার সময় একটু খাবার আলাদা করে রাখা, পরে যেগুলো পাখিদের খাইয়ে দিতে হয়। পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো করা হয়। যে কোন ঋণ শোধ করা অবশ্যই কর্তব্য, যদি না করা হয়, এটা তখন পাপ হয়ে যাবে। হিন্দুদের কাছে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আসে মনুষ্য ঋণ, আমরা যে সমাজে আছি, সেই সমাজের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। অতিথিকে খাওয়ানো, গরীব-কাঙালীদের খাওয়ানো, এগুলো সব নৃ-যজ্ঞ, যা কিনা আমাদের মনুষ্য ঋণ থেকে মুক্ত করে। এগুলোর সাথে দান করা, যাতে সমাজের সেবা হয়। এরপর আসে ভূত-ঋণ, রাস্তার কুকুরগুলোকে, গরু বা অন্যান্য পশুদের খাওয়ানো।

এই পঞ্চ ঋণ, এটা আবার পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ আবার করে দেওয়া যায়। আমরা আগেকার দিনে দেখতাম আমাদের ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, বাবা, কাকা, জ্যাঠা, মায়েরা সব সময় পূজা অর্চনা নিয়েই থাকতেন। আগেকার দিনে লোকের পিতৃ আরাধনাটাই করতেন, পিতৃযজ্ঞ এখন আর আগের মত অত পপুলার নয়। মনুষ্য যজ্ঞে, সমাজ সেবাতে নিজের জীবনটাকে চেলে দিয়েছেন। স্বামীজী এটাকে বলছেন বিরাটের পূজা, সমাজ সেবাটাও একটা way of life। ঠিক তেমনি নীচে যারা আছে, প্রাণীকুল, এদের দেখাশোনা করা, এই ভূতযজ্ঞও একটা way of life হতে পারে। এই সব কিছুর অর্থটা হল, যাদের থেকে আমরা পেয়েছি, তাদেরকে এবার ফেরত দিতে হবে। মহাভারতে যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন; তার মধ্যে একটা প্রশ্ন হল – নিঃশ্বাস নিচ্ছে অথচ মৃত, কে? উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, যে পঞ্চ ঋণ শোধ করে না। তার মানে যে হিন্দু যদি নিত্য এই পাঁচটি যজ্ঞ করে না, সে নিঃশ্বাস নিয়েও মৃত।

এই যে আমাদের আলোচনা হল, শ্রী, বিশ্রী, লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রতা, লক্ষ্মী; এগুলোর পিছনে রয়েছে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞ যদি না করা হয়, আজকে হোক, কালকে হোক, তার শ্রী চলে যাবে। তার চেহারার উপর যে ঝকঝক ভাব, এটা চলে যাবে। অন্তত একটাও যদি পুরোদমে করা হয়, যদি পুরো জীবনটা পঞ্চ মহাযজ্ঞে না দিয়ে শুধু ঋণ রূপে নেওয়া হয়, আচ্ছা আমি কোন ভাবে এটাকে ঠেকা দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি, তাহলেও তার একটা শ্রী থাকবে। যদি সেটা না করা হয়, তাহলে আস্তে আস্তে সেই শ্রীটা চলে যাবে।

বিশ্বাসবাবুর যে কথা এখানে চলছে, উনি পঞ্চ ঋণ করেননি, যজ্ঞ তো করেনইনি। যজ্ঞ হল, যেখানে আপনার জীবন এটাতেই চলে গেছে। ঋণ হল, কোন রকমে একটু একটু করে চালিয়ে যাওয়া। এখন হিন্দুরা হল living religion, কবে কে এক হাজার, দু হাজার বছর আগে বলে দিয়ে গেছেন, সেটাই আমরা পালন করেছি, সে-রকম কিছু না। হিন্দুদের কোড্ থাকে ফিল্ড, আর ওর যে বডি, ওটা ডায়নামিক। ঠিক আমাদের জীবনের মত। জীবাত্তা, আমাদের ভিতরের আত্তা ফিল্ড, শরীরটা পাল্টে যাচ্ছে, রোজ পাল্টাচ্ছে। তার পিছনে জীবাত্তা সূক্ষ্ম শরীর, ধীর গতিতে পালটায়। তারও পিছনে যে আত্তা, কখনই পালটায় না। হিন্দু ধর্ম ঠিক এই রকম।



পঞ্চ ঋণের কথায় এখানে যে মনুষ্য ঋণের কথা বলা হল, এই মনুষ্য ঋণ থেকে মুক্ত ঠিক ঠিক হয়, যেখানে অতিথি সেবা আদি করা হয়। আমাদের পূর্বজরা এটা কখন কল্পনাই করেননি, আগে আগে যে ঋষিরা ছিলেন, তাঁরাও কল্পনাই করেননি যে, মানুষ তাঁর নিজের স্ত্রীকে দেখবে না, সন্তানকে দেখবে না। এটা এই নূতন কালের একটা রোগ। ঠাকুর এখানে নিজের তরফ থেকে তাই বলছেন – পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে। তৈত্তেরীয় উপনিষদে বলছেন, *মাতৃদেব ভব পিতৃদেব ভব*, তার মানে বাবা-মায়ের সেবা যজ্ঞ রূপে করবে। তার মানে মা-বাবার প্রতি যে কর্তব্য কর্ম, এটা মনুষ্য যজ্ঞে যাবে না, যাবে দেবযজ্ঞে, অর্থাৎ নিত্যপূজার অঙ্গ।

ঠাকুর পরিবারদের সম্বন্ধে যে ঋণের কথা বলছেন, এখানে আমার নিজের ব্যাখ্যা দিচ্ছি –এটা অনেকটা মনুষ্য যজ্ঞে পড়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে, আর সতী স্ত্রী হলে তার প্রতিপালন করতে হবে। এটা কি রকম, মনুস্মৃতিতে খুব সুন্দর বলছেন –একটা বয়স হয়ে গেলে, কানের উপরের চুল যদি পেকে যায়, তার মানে তখনকার দিনে পঞ্চাশ বছর ধরছেন, আর বলছেন নাতির মুখ যখন দেখে নিয়েছে। আগেকার দিনে পঞ্চাশ বছরে নাতির মুখ দেখে নিত। তখন সেই গৃহস্থ বাণপ্রস্তু হয়ে যাবে। বাণপ্রস্তু হওয়ার শর্তগুলি খুব মজার, নিজের স্ত্রীকে বলবে, তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে? স্ত্রী যদি বলে, আমি যাব না। বলছেন, স্ত্রী যদি এই কথা বলে, তখন তার থাকা-খাওয়ার পুরো ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তা না করে তুমি বাণপ্রস্তু হতে পারবে না। একজন সন্ন্যাসী হবে, সে বিয়ে করেছে, কিন্তু কোন কারণে সংসার জমল না, সে বলল, আমি সন্ন্যাসী হব আমি চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি চলে যেত পার, কিন্তু যাওয়ার আগে তুমি স্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলে, তুমি তার হাত ধরে ওর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছ আর হঠাৎ তুমি বলবে, তুমি নিজের বাড়িতে চলে যাও; এটা হবে না। আর সন্তানকে তো কোন মতেই ছাড়া যাবে না। পরিবার, সন্তান এদের প্রতি কর্তব্য আছে। ঠাকুর এটার উপর জোর দিচ্ছেন। ঠাকুর এটা বলছেন না যে, ঠিক আছে দারিদ্র হয়েছ, এবার সব ছেড়ে ঠাকুরের দিকে মন দাও, বরং ঠাকুর এর নিন্দা করছেন।

আমার বক্তব্য ছোট। গৃহস্থ ধর্মে, এমনকি সন্ন্যাসী যাঁরা –নিজের স্ত্রীর রক্ষা করুন। ঠাকুরের বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা দেখবেন; রাখাল, পরে যিনি রাজা মহারাজ হয়েছিলেন, তিনি কারুকে কোন মিথ্যা কথা বলেছেন। পরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। ঠাকুর রাখালের দিকে তাকিয়ে বলছেন, কিরে, তোর মুখে একটা কালো ছায়া দেখছি? শ্রী হারিয়ে গেছে, মিথ্যা কথা বলেছেন কিনা। আমরা যদি নিজেদের জীবনের পিছনের দিকে তাকাই, বাচ্চা বয়সে প্রথম যেদিন মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছিলেন, যদি আপনাদের মনে থাকে, দেখবেন তখন ভিতর থেকে কেমন ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন, ধরা না পড়ে যাই। কিন্তু মা-বাবারা অনেক সময় ধরতে পারতেন না, কিন্তু মায়েরা সাধারণ ভাবে সন্তান মিথ্যা কথা বললে ধরে ফেলেন, মা অনেক সময় কিছু বলেন না। কারণ সন্তানের একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে কিনা, মা সেইজন্য কিছু বলেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা ভয়ে কাঁপি। এটা বুঝতে হয়, যখনই আমরা কোন অন্যায্য কাজ করি, যেই হোক, সাধু হোক, সন্ন্যাসী হোক, গৃহস্থ হোক, অন্যায্য কাজ করা মানে, আপনার মধ্যে তমোগুণের প্রভাব এসেছে। তমোগুণ এলেই মুখের উপর একটা ছায়া পড়ে যায়। ছায়া পড়তে পড়তে একটা সময় শ্রীহীন হয়ে যায়। নেতাদের অনেক সময় দেখবেন, তাঁরা এত অন্যায্য কাজ করেন, প্রথমে দিকে যতই পাওয়ারফুল হোক, যাই হোক; দেখে মনে হয় এর ক্ষমতা কোন দিন যাবে না। কিছু নেতাদের চেহারাগুলো লক্ষ্য করে দেখবেন, তাঁদের চেহারা বকঝকে থাকে। আবার কিছু নেতা-নেত্রী আছে, কিছু দিন পরে তাদের চেহারাগুলো কেমন প্রেত-প্রেতনীর মত লাগে, রাক্ষস-রাক্ষুসীর মত কেমন কঠোর হয়ে যায়। আরও কিছু দিন পরে দেখা যায় এরা আরও বিনাশের দিকে চলে গেছে। হয় ক্ষমতা চিরদিনের মত চলে গেল বা জেলে চলে গেল। এটা আস্তে আস্তে নাশের দিকে যায়। কারণ পূর্ব পূর্ব এত শুভকর্ম রয়েছে, যার জন্য ওকে কেউ ছুঁতে পারে না। ওই অহঙ্কারে সে মনে করে, আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু বোঝে না যে, যে ধরণের বাজে কর্মে লিপ্ত হচ্ছে যে, ওই শ্রীটা

তার হারিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর এটাকে একেবারেই পছন্দ করছেন না, সেইজন্য বলছেন – সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। আপনি তাহলে সব ছেড়ে বেরিয়ে যান, সন্ন্যাসী যদি না হতে পারেন, অন্তত বাণপ্রস্ট্রীর মত হয়ে যান।

ভাগবত ক্লাশে তিন-চার বছর আগে এক বয়স্ক মহিলা আসতেন। চেহারাটা ওনার খুব ঝকঝকে ছিল। আর সব সময় হাসতেন। দেখে আমি অবাধ হয়েছিলাম। পরে আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, বাড়িতে কেউ নেই, বিবাহ করেননি। তারপর একদিন হঠাৎ এসে আমাকে প্রণাম করে বললেন, ‘মহারাজ আমি কাশী সেবাশ্রমে চলে যাচ্ছি, ওখানে জায়গা পেয়েছি, এখন আমি পুরো সময়টা জপধ্যানেই কাটা’। ক্লাশে উনি আসতেন, কোথাও ওনার একটা সাদামাটা জীবন ছিল, সেটা পুরোটা ঠাকুরের প্রতি চলে গেছে, এমন চলে গেছে যে চেহারা ঝকঝক করছে, শ্রীযুক্ত চেহারা।

ঠাকুর বলছেন, সঞ্চয় কে করবে? সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। এখন আপনি যদি গায়ের জোরে বলেন, আমিও সাধু, তাই আমি সঞ্চয় করছি, তা হবে না। আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আছি, সঙ্ঘের দায়িত্ব আমাদের উপর, আমরা সঙ্ঘকে ফাঁকি দিতে পারি না। সঙ্ঘে আমি চুর করতে পারি না। কিছু দিন আগে হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছেন, অফিসের কোন কর্মচারী যদি কিছু গোলমাল করে থাকে, তাহলে তার যে অধিকার আর অন্যান্যরা যারা গোলমাল করেনি তাদের অধিকারের সমান হবে না। তার মানে আপনি যেখানে কাজ করছেন, যেখানে আছেন, তার প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যকে আপনি কক্ষণ অবহেলা করতে পারেন না। যদি অবহেলা করেন, তাহলে আপনি জেনে নিন, আপনি আস্তে আস্তে বিনাশের দিকে চলে যাবেন। জুয়া খেলছেন, মদ খাচ্ছেন, অন্যান্য এমন গর্হিত কাজে লিপ্ত আছেন যে, আপনার বাড়ির টাকা-পয়সা তাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার আপনি বিনাশের দিকে যাচ্ছেন। যদি আপনি নিজেই নিজেকে আটকে দিতে না পারেন, কদিন পরে কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না। একদিন ভিতরে একটা সেলফ এ্যাক্সপ্লোশান হয়ে বুম্বাম্ করে আপনার সব কিছু বার করে আনবে, আপনার সব শেষ।

### বলরাম – এখন বিশ্বাসের সাধুসঙ্গ করবার ইচ্ছা।

এই কথা শোনার পর আমরা কাঁচা মন থেকে বলব, দেখ এখন তাও তো একটু মতিগতি হয়েছে। সমস্যাতে পড়ে জীবনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে তারপর আমাদের কাছে এসে বলে – আমাকে উদ্ধার করুন। একবার ভেবে দেখুন, নিজের এই সর্বনাশ করতে আপনি কত বছর লাগিয়েছেন। এই সর্বনাশের জন্য দায়ী কে? আপনি নিজে। যখন পড়াশোনা করার কথা ছিল, তখন পড়াশোনা করলেন না, নিজেকে যখন তৈরী করার ছিল, তখন তৈরী করলেন না। তার উপর প্রতি পদক্ষেপে একটার পর একটা ভুল করে গেলেন। আজ বিধ্বস্ত হয়ে আমাদের কাছে এসে বলছেন – ঠাকুর কৃপা করছেন না, আপনারা কিছু একটা করুন। কোথা থেকে করব? মা লক্ষ্মী যখন আপনাকে কৃপা করছিলেন, তখন আপনি লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছেন। আমরা কোথা থেকে লক্ষ্মীকে ধরে নিয়ে আসব? ঠাকুর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কাকে পাবেন যে কিনা ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছে। বেশির ভাগই ভক্ত যারা এদিকে আসে, তারা কেউই not out of option। সব কটা আসে out of compulsion থেকে, এ-ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। আগেকার দিনে লোকেরা দেখত, ছেলে এমন কিছু করছে না, পড়াশোনাটাও ছেড়ে দিয়েছে, ওকে বিয়ে দিয়ে দাও। বিয়ে কেন দেবে? কিছু করছে না, তাই বিয়ে দিয়ে দাও। ঠিক তেমনি আর কিছু হচ্ছে না, ভগবানের দিকে যাওয়া যাক। ঠাকুর দেখুন কেমন তুড়ি মেরে বলরামের কথাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – সাধুর কমণ্ডলু চারখাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সে-সব চন্দন হয়ে যায়! কিন্তু শিমুল, অশ্বথ, আমড়া এরা চন্দন হয় না।

এই যে আমরা আগে শ্রী আর সার পদার্থের কথা বললাম, শ্রী আর সার পদার্থ যদি না থাকে কোন কিছু হবে না। আপনি যত ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করুন, যত বেলুড় মঠে গিয়ে খিচুরি খান, যতই আপনি মুখে চরণামৃত দিন, প্রথমে দেখুন আপনার শ্রী আছে কিনা, ভিতরে আপনার দম আছে কিনা। নরেনকে দেখে ঠাকুর দেখুন কেমন চমকে যাচ্ছেন। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন, এর ভিতরে মাল আছে। ভিতরে সার যদি না থাকে, কোথা থেকে হবে? ঠাকুর যে নরেনের নামে সবার কাছে এত প্রশংসা করে যাচ্ছেন, কারণ ভিতরে সার আছে। আমি আপনি ভিতরে সার তৈরী করলাম না, অল্প একটু গুণ যা পরিবারের গুণে, সমাজের গুণে এসেছিল, সেটাকেও আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। আর এখন বলছি, হে ঠাকুর কৃপা কর।

**কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে, গাঁজা খাবার জন্য।** আমি মজা করে বলতাম, আমার এই কথাকে আপনারা দয়া করে অন্য ভাবে নেবেন না – আমি বলতাম, স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলেছিলেন, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ আর এখন নূতন একটা যোগ শুরু হয়েছে, খিচুরিযোগ, খিচুরি খেলেই তার মুক্তি হয়ে যাবে। এখন গাঁজা খাওয়ার জন্য না, আমাদের কাছে এসেই বলবে – আমি রামকৃষ্ণ মিশনের অমুক সন্ন্যাসীকে জানি, ওই সেন্টারে ঘুরে এসেছি, আর অমুক মঠের গেস্ট হাউসে ছিলাম, ওখানে মহারাজরা কি খাতিরই না করলেন।

আমাদের বেলুড় মঠে অনেক আগে মুরখরাম নামে একজন নরসুন্দর ছিল। অনেক আগে প্রায় ১৯৪০ সালে এখানে এসেছিল। ওর নাতিও এখানে কাজ করেছে, ইউপির লোক। সেও এখন চলে গেছে। মুরখরাম নাপিত, কিন্তু, আগেকার দিনে ভারতবর্ষের লোকেরা যেমন ছিল, সেও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। রোজ মঙ্গলারতিতে মুরখরাম বেলুড় মঠের মন্দিরে থাকবেই থাকবে। ব্রহ্মচারী মহারাজদের ব্যঙ্গ করে বলত – আপনাদের টুনটুনি না হলে ঘুম ভাঙে না। আমাদের ব্রহ্মচারীরা ভোর তিনটে চল্লিশে ঘুম থেকে উঠে পড়েন। এ্যালার্ম দিয়ে রাখেন, যাতে সময় মত মঙ্গলারতিতে আসতে পারেন। মুরখরাম বলত, আমি রাত্রিবেলা দু গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ি, ওটাই আমার টুনটুনি, ওটাই আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়, আর আমিও চলে আসি।

একবার আমেরিকা থেকে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ বেলুড় মঠে এসেছেন সন্ন্যাসের জন্য। মুরখ সবাইকে ভালবাসত। প্রভু মহারাজ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ওকে খুব স্নেহ করতেন। আমেরিকান ব্রহ্মচারী মহারাজকে দেখে মুরখ অন্য একজন মহারাজকে হিন্দিতে বলছেন, ‘জিজ্ঞেস করো, কেমন লাগছে এখানে?’ সেই ব্রহ্মচারী মহারাজ বলছেন, ‘খুব ভাল লাগছে, and food is good’। মহারাজ অনুবাদ করে মুরখরামকে বলছেন, ‘উনি বলছেন, এখানকার খাওয়া-দাওয়া ভাল’। মুরখ হিন্দিতে সেই মহারাজকে বলতে বলছেন, ‘হারামজাদে কো বোলো, ওই আমেরিকা ছেড়ে এখানে কি খেতে এসেছে? আমি যখন জিজ্ঞেস করছি, সে আমাকে খাবার কথা বলছে?’ উনি অনুবাদ করে ব্রহ্মচারী মহারাজকে বলে দিয়েছেন। সেই ব্রহ্মচারী মহারাজ হাতজোড় করে বলছেন, ‘এইজন্যই ভারত ধন্য, একজন নাপিত এইভাবে একজন সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, হারামজাদা তুমি এখানে কি খেতে এসেছ? জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে এখানে আর তুমি আমাকে খাওয়ার কথা বলছ?’ এই হল ভারতবর্ষ।

শঙ্করাচার্য যখন মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে তর্ক করতে গেছেন, লোকেদের জিজ্ঞেস করছেন, মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি কোনটা? তখন বলা হচ্ছে, যার বাড়ির সামনে দেখবেন একটা টিয়াপাখি আর ময়না সংস্কৃতে শাস্ত্রার্থ করছে, বুঝবেন ওটাই মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি। তার মানে দেশে তখন এমন পাণ্ডিত্য যে, সেই দেশের টিয়া আর ময়নাও সংস্কৃতে শাস্ত্রার্থ করে। আর আমরা কোথায় নেমে গিয়ে বলছি, মহারাজ জয়রামবাটি গিয়েছিলাম, ওখানকার মহারাজ কি খাতিরই না করলেন। ঠাকুর এটাই বলছেন, কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য, তখনকার দিনে সাধুরা গাঁজা খেত কিনা।

**সাধুরা গাঁজা খায় কিনা, তাই তাদের কাছে এসে বসে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়।**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ  
ষড়ভূজদর্শন ও শ্রীরাজমোহনের বাড়িতে শুভাগমন – নরেন্দ্র

১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২, ঠাকুর কলকাতায় সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন, তার বিশদ আলোচনা করেছি। একজন প্রশ্ন করছেন, সাধুর কমণ্ডলু চারধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে, এই ব্যাপারটি কি, জানতে চাইছেন। আসলে আমার কাছে অনেক কিছু মনে হয় সবাই জানেন, সেইজন্য সব কথা ব্যাখ্যা করি না। তাতেও অনেক আপত্তি করেন যে, আমি অনেক বেশি ব্যাখ্যা করি। কমণ্ডলু বলতে আমরা সাধারণ ভাবে আজকাল পিতলের যে কমণ্ডলু দেখি, সেটাকেই মনে করি। কিন্তু আগেকার দিনে সাধুরা পিতলের কমণ্ডলু ব্যবহার করতেন না। যাঁরা একটু সচ্ছল ছিলেন তাঁরাই পিতলের কমণ্ডলু ব্যবহার করতেন। সাধারণ ভাবে সাধুরা যেটা ব্যবহার করতেন, ওটাকে বলে তুম্বা। তুম্বা তৈরী হয় চালকুমড়ো থেকে। চালকুমড়োর ভিতরের শাঁসগুলো ফেলে শুকিয়ে নেওয়া হত, একটা বিশেষ ভাবে প্রসেসিং করা হত। ওটাকেই কমণ্ডলুর মত বানিয়ে নেওয়া হত। আগেকার দিনে বেশির ভাগ সাধুরা ওটাই ব্যবহার করতেন। ইদানিং কালে আমি আর এই ধরণের কমণ্ডলু দেখতে পাই না, তবে ছোটবেলা আমরা দেখেছি। চালকুমড়ো একটু তেতো হয়, চিনি দিয়ে মোরঝা তৈরী হয়। কিন্তু তারপরেও আরও কি কি জিনিস মেশাতে হয় তেতোটাকে নাশ করার জন্য। সাধুর যে তুম্বা, যাকে কমণ্ডলু বলে, যতই সাধুর সঙ্গে চারধাম ঘুরে আসুক, বা যত তীর্থেই যাক, তার তেতো ভাবটা যায় না।

মহাভারতে একটা জায়গায় যুধিষ্ঠির ধর্মের ব্যাখ্যা করছেন, সেখানে তিনি বলছেন – শাস্ত্র পড়ে, গুরুর কথা শুনে প্রজ্ঞা জন্মায়, প্রজ্ঞা মানে বুদ্ধি থেকে আরেকটু উপরে। যেখানে ঠিক ঠিক বোঝা যায় শাস্ত্র জিনিসটা কি, যখন একটা জিনিসের ব্যাপারে বুদ্ধিটা খুলে যায়। অনেক বাচ্চাদের আমরা বলি, এর প্রচুর বুদ্ধি আছে; অনেক সময় আবার বলি, বুদ্ধি আছে কিন্তু জানে না কোথায় বুদ্ধিটা লাগাতে হবে। প্রজ্ঞা মানে বুদ্ধিটা যেখানে পুরো খুলে গেছে। বলা হয়, যখন প্রজ্ঞা খুলে যায় তখন শাস্ত্রবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। আমরা অনেক সময় মনে করি, যা জানার তা তো জেনে গেলাম; কথামৃত পড়া হয়ে গেছে, ইস্টমন্ত্র নিয়েছি, হয়ে গেল, আর কি দরকার। যাঁরা আমাদের ক্লাশগুলো মন দিয়ে অনেক দিন শুনছেন, তাঁদেরকেও বাড়ির লোকদের কাছ থেকে শুনতে হয় – অনেকদিন তো শুনলে, কতদিন আর শুনবে, এই করে কি সময় নষ্ট করা যায়? তা না, দীর্ঘদিন ধরে শুনতে হয়। পেরা তৈরী করতে গেলে দুধকে যেমন অনেক সময় ধরে জ্বাল দিতে হয়, ঠিক তেমনি শাস্ত্রকেও অনেকদিন ধরে জ্বাল দিতে হয়, তবে গিয়ে প্রজ্ঞা জন্মায়। প্রজ্ঞা জন্মালে আসে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, আগে প্রজ্ঞা তারপরে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হল ঠিক ঠিক বিশ্বাস। এখন আমরা যেটা করছি, এটা কথার কথা। আরও পাঁচজন করছে, সেই দেখে বা শুনে আমরাও করছি।

যেমন ধরুন যাঁরা বৈষ্ণব পরিবারের আছেন, তাঁদের পরিবারে একটা খুব strong culture থাকে। বৈষ্ণবদের দেখবেন, তাঁরা যতই শিক্ষিত হন, আর যাই হন, সবাই তিলক কাটবেন, মালা জপ করবেন, আরও অনেক কিছু করেন, এই ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের নিয়মাদি খুব কঠোর ভাবে পালন করেন। এই জিনিস এনারা বাড়ির পরম্পরাতে পেয়েছেন। কিন্তু তাই বলে যে তাঁরা ঈশ্বরের পথে পুরোপুরি চলে গেছেন তা না, এখনও যাননি। ওটা করতে করতে যখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস এসে যায়, প্রজ্ঞা যখন জন্মে যায়, তারপরে তাঁর শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা জন্মায়। আর যখন শাস্ত্রবাক্যে প্রজ্ঞা জন্মে যায়, সেখান থেকে যখন শ্রদ্ধা হল, তারপরে বলে হ্রী। হ্রী মানে লজ্জা। লজ্জাবোধ থাকলে মানুষ ভুল কাজ করতে চায় না। যিনি ধর্মপথে যান, তার পক্ষে ধর্মপথের বাইরে সবটাই লজ্জার ব্যাপার। সেখান থেকে ধর্মের জন্ম নেয়। ঠিক ঠিক ধর্ম বলতে যেটা বোঝায়, সেটা আসে এরপরে। হ্রী একবার এসে গেলে সে আর ডানদিক বামদিক যাবে না, সেখান থেকেই ধর্মের জন্ম নেয়।

এই কথা বলার পর যুধিষ্ঠির বলছেন – যার মধ্যে ধর্ম জন্মায়নি, সে পুরুষও না সে নারীও না, সে একটা ফ্লীব। ঠাকুর যে কমণ্ডলুর কথা বলছে, তিনি ওটাই বলতে চাইছেন। আমরা যতই তীর্থে যাই, যতই শাস্ত্র কথা শুনি, আমাদের মন কোথাও যেন অপরিবর্তিত থেকে যায়। পাথরকে আপনি বছরের পর বছর জলের মধ্যে ফেলে রাখুন, পাথরের মধ্যে জল ঢুকবে না। কিন্তু স্পঞ্জ জলের একটু সংস্পর্শে আসলে জলকে নিজের মধ্যে টেনে নেয়। ঠাকুর এখানে ওই প্রস্তুতিটার কথা বলছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ যখন শুরু হয়, সেখানেও বাইচান্স এই জিনিসটাই চলছে।

আগের দিন ঠাকুর গড়ের মাঠে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন, পরের দিনেই তিনি কলকাতার গরাণহাটায়, বর্তমানে নিমতলা স্ট্রীটে ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করতে গেছেন। **বৈষ্ণব সাধুদের আখড়া; মহন্ত শ্রীগিরিধারী দাস।** সেখান থেকে ঠাকুর সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহনের বাড়িতে এসেছেন। ব্রাহ্মভক্তরা আছে, হঠাৎ সেখানে নরেন্দ্র এসেছেন। দিনটা ছিল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই নভেম্বর, ১৮৮২।

**ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আর বলিলেন, “তোমাদের উপাসনা দেখব”।** ঠাকুর যেখানে যেখানে যেতেন, সেখানে তিনি লোকদের ভিতর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যে কারুর উপর জোর করে চাপাতেন, তা না। ঠাকুর দেখে নিতেন, চেতনার কোন স্তরে আছে। হিন্দু ধর্মের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, হিন্দু ধর্ম বলে, যে যেখানে আছে তাকে সেখান থেকে তুলে নিতে হবে। বিশেষ করে মহাভারতে যেভাবে সব কিছু চলে, সেখানেও এটাই করা হয়েছে। যে গৃহবধূ, সে গৃহবধূই থাকবে। অনেকে আমাদের মন্তব্য করেন, আমরা সংসারী আমরা কি করে যোগ করব? যোগ আপনার জন্য নয়, যাঁরা যোগী হবেন তাঁদের থাক আলাদা; ঠাকুর আগে থেকেই তাঁদের সেভাবে তৈরী করেছেন।

এখানে একটা মজার কথা বলি। আমার বৃকে একটু প্রবলেম আছে, ইনহেলার নিতে হয়। অনেক আগে, প্রায় পনের-কুড়ি বছর আগে, তখন আমার বয়স কম ছিল, একদিন হঠাৎ রেগেমেগে বললাম, আমি সন্ন্যাসী হয়ে কেন আলতুফালতু জিনিস করছি, ইনহেলার নেব না। কয়েক দিন পর থেকে দেখছি শরীরটা একটু খারাপ হতে শুরু হয়েছে। একজন মহারাজকে যখন পুরো জিনিসটা বললাম, শোনার পর উনি বললেন –‘তোমার কি মাথায় থাকে না যে, তুমি যোগী নও, তুমি একটা রোগী’? কথাটা খুব দামী কথা। তুমি যোগী না, এই কথা বলে উনি এটা বলতে চাইছেন না যে, তুমি সন্ন্যাসী না। উনি বলতে চাইছেন, যাঁরা প্রাণায়ামাদি করে নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ কয়েম করে এগিয়ে যায়, তারা আলাদা জিনিস। তুমি সেই থাকের না, তোমার বৃকের সমস্যা আছে, তা হতেই পারে। ঠাকুরের ক্যান্সার ছিল, স্বামীজীর অনেক ধরণের রোগ ছিল, আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজের শরীরের সমস্যা আছে, হতেই পারে। লোকেদের এটা একটা বিচিত্র ধারণা যে, সন্ন্যাসীদের রোগ-শোক হয় না, তা না। রোগ-ব্যাদি শরীরের ধর্ম, শরীর থাকলে এগুলো হবে। যাঁরা যোগী, তাঁদের শরীরও সেই রকম হয়। তাঁরা নিজেদের সেভাবেই ট্রেনিং দেন। স্বামীজী একজন সন্ন্যাসী, তিনি মিলিটারি ম্যান না, মিলিটারির ট্রেনিংটা পুরো আলাদা। স্বামীজী যদি মিলিটারিতে চলে যেতেন, জানিনা তখন কি হত; কিন্তু ওটা পুরো আলাদা জিনিস। যখন ঠাকুর কাউকে কোন কথা বলছেন, তখন তিনি দেখে নিচ্ছেন, এর থাকটা কি। ইদানিং কালে ইউটিউব, ফেসবুক আদি হয়ে গিয়ে ধর্মকে নিয়ে, শাস্ত্রের কথা নিয়ে সবাই সবাইকে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে, আর সবটাই ভুলভাল।

একদিন বাইরের এক বাবাজী এই ইউটিউবেই কথা বলছিলেন, আর এত থার্ড গ্রেড জিনিস বলছেন, আর সেটাকে নিয়ে পড়াশোনা করা লোকেরা তালি দিচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু পুরো জিনিসটাতেই তিনি অযৌক্তিক সব কথা বলে গেলেন। এত কথা বলছিলেন যে মনে হচ্ছিল যেন information bombarding হচ্ছে আমাদের উপরে। আমরা ইনফরমেশানের সমুদ্রে হাবডুবু খাচ্ছিলাম। আর যখন যেটা মনে হয়, তখন মনে করে, এটা করলেই আমি সাফল্য পেয়ে যাব, আমি

এটাই হতে চাই। একবার ভেবে দেখুন, সবার জন্য সব জিনিস নয়। শতীন তেঙুলকার ফুটবলের জন্য না, পেলে ক্রিকেটের জন্য না। পেলে নিজের জায়গায় বড়, শতীন তেঙুলকার নিজের জায়গায় বড়। আপনিও নিজের জায়গায় বড়, একজন যোগী মহাত্মা অন্য জায়গায় বড়। আপনি কেন ওর ধর্মটা নিতে চাইছেন? আপনি যে জায়গাতে আছেন, সেই জায়গাতে আপনি শক্তি সঞ্চয় করুন। সেই জায়গাতে যখন শক্তি সঞ্চয় করবেন, এরপর সেখান থেকে আপনি আশ্বে আশ্বে উপরে উঠে আসবেন। ঠাকুর সবার মধ্যে এই জিনিসটাকে সব সময় লক্ষ্য করতেন। ঠাকুরের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ঠাকুর তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে বিভিন্ন সাধনার পথে নিয়ে গেছেন। পরে স্বামীজী নিজের গুরুভাইদের ও অন্যান্য শিষ্যদের নামে বলে গেছেন—ঠাকুর অনেককে অনেক কিছু শিখিয়ে গেছেন, সব শিক্ষাকে এক জায়গায় এমন ভাবে সংগ্রহ করে রাখতে হবে, যাতে সবার জন্য ঠাকুরের শিক্ষা সংরক্ষিত থাকে। সেভাবে হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমরা যে স্মৃতিগুলি পাই, বা শরৎ মহারাজের যে লীলাপ্রসঙ্গ পাই, সেখানে অনেক কিছু এসে গেছে। ঠাকুর যখন বলছেন, ‘তোমাদের উপাসনা দেখব’, এখানেও উদ্দেশ্য সেটাই।

নরেন্দ্র গান করছেন। এরপর উপাসনা হচ্ছে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মভক্তরা একটু ধ্যান-ট্যান করতেন। বর্ণনা করছেন— ছোকরাদের মধ্যে একজন উপাসনা করিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই।

আপনারা এটা অন্য ভাবে নেবেন না, খারাপ কিছু মনে করবেন না; এখানে একটা ব্যঙ্গ আছে। আমাদের সবারই এটা হয়— ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই। আমাদের কাছেও এই ধরণের প্রচুর প্রশ্ন আসে, বুঝতে পারি না, কি উত্তর দেব। ঈশ্বরে মগ্ন হওয়া কি অত সহজ, খুব কঠিন। আমরা যে কথামৃত অধ্যয়ন করছি, এই কথামৃত সমস্ত বেদের সার। যতটা পারছি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। যদি মন দিয়ে শোনে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। এটা দেখবেন, ঈশ্বরের দিকে এগোন থিয়োরিটিক্যালি খুব সোজা, প্র্যাক্টিক্যালি অত্যন্ত কঠিন। ঠাকুর বলতেন, তবলার বোল মুখে বলা যায়, কিন্তু হাত দিয়ে বাজানো খুব কঠিন। অনেক সময় কি হয়, কোন নামকরা লোক, যিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, সমাজে যাঁর নাম হয়েছে, এমনকি টাকা-পয়সা হয়েছে, তাঁদেরকে দেখলে মনে হয়, আমি এই রকমই হব। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের যদি দেখেন, ফিল্মস্টারকে দেখলে বলবে আমি ফিল্মস্টার হব, টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় বলে আমি অমুক ক্রিকেটার হব, এটা হতে থাকে।

ওখানে ঠাকুর আছেন, তখন ঠাকুরের নাম একটু একটু হতে শুরু হয়েছে বা এমনও হতে পারে, ঠাকুরের উপস্থিতির জন্য ওই জায়গাতে একটা তন্মাত্রা সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই যে বলছেন, যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই, এটা কিন্তু পুরোপুরি কথার কথা। আমরা যদি অন্য ভাবে দেখি—এ-ধরণের কথা যারা বলে, অনেক সময় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই তাদের এই কথাতে, আহা কি ভক্তি তার। আমরা নিজেরারাও ওই রকম হাঙ্কা কিনা, তাই। আমাদেরও যখন বয়স কম ছিল, তখন এই ধরণের কথা শুনলে অনেক কিছু মনে হত। উতলো মন কিনা, একটুতেই লাফাতে শুরু করে দেয়। যার জন্য আমরা একটুতেই রেগে যাই, একটুতেই খুশি হয়ে যাই। কেউ মিষ্টি করে কথা বলল, আকাশে পৌঁছে গেলাম; কেউ কটু কথা বলল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই ধপাস করে পড়ে গেলাম—এগুলো উতলো মনের লক্ষণ, গভীর মন হলে এ-রকম হয় না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার উদ্দীপন হইয়াছে। তাই সর্বত্যাগের কথা বলিতেছেন। মাস্টার ঠাকুরের খুব কাছে বসিয়াছিলেন, তিনিই কেবল শুনিতো পাইলেন, ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন— তা আর হয়েছে।

অনেকের কাছে এই কথাটা নেতিবাচক মনে হবে। কিন্তু নেতিবাচক নয়। গীতাতে যেমন বলছেন— স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, তোমার যে পথ সেটাতে ঠিক থাক। এর আগে আগে তোমার যেমন জন্ম ছিল, জন্মানুসারে যেমন কর্ম ছিল, যেমন জ্ঞান ছিল, সেই অনুসারে তুমি আজকে একটা জায়গায়

এসেছে। এবার আর দুমদাম করে পাল্টে নিওনা। এবারেও যদি দুমদাম করে পাল্টে নাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে প্রচুর কষ্ট পেতে হবে। তবে হ্যাঁ, ওই কষ্টটাকে যদি সহ্য করে নিতে পার, তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে এগোবে, এর জন্য তোমাকে সময় দিতে হবে। আমাদের মুশকিল হল, ভাল কোন কিছু দেখলে হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমরা তখন চাই, আমিও এটাই করব। ঠাকুর যদি কাউকে দেখেন কেউ এ-রকম করছে, ঠাকুর খুশী হতেন না, হেসে উড়িয়ে দিতেন। এখানেও ঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এর আগে আগেও এই ধরনের বর্ণনা এসেছে, এক জায়গায় একজনের সম্বন্ধে বলছেন—এ আবার আমড়া খাবে। এখানে বলছেন—তা আর হয়েছে। একটু বিচার করতে হয়। আমাদের কাছে অনেকেই এসে ইমোশানালি বলে—মহারাজ আমাদের কি কিছু হবে না? হবে না মানে! সবারই জ্ঞান হবে, সবারই মুক্তি হবে, সংসার মানেই তাই, কিছু না হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই; তবে সময় লাগবে।

কয়েক বছর আগে অনেক দূর থেকে এক মহিলা এসেছিলেন, শুনলাম তার নাকি প্রচুর ঠাকুর দেবতার দর্শন হয়। আমার সাথে একটা পরিচয় ছিল, আমাকে প্রশ্ন করছেন, ‘আচ্ছা এইসব দর্শনের ব্যাপারে আপনার কি আইডিয়া?’ আমি বুঝতে পারিনি যে ওনারই এই দর্শনাদি হয়, আসলে নিজের ব্যাপারেই জানতে চাইছেন। সেইজন্য আমি বলে দিলাম, ‘আমি যদি শুনি কারুর এইসব দর্শন হচ্ছে, প্রথমেই আমি তাকে বলব, আপনি একজন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখান’। উনি আমার উপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। আমাকে আজবাজে কথা বলতে শুরু করলেন।

আসলে আমরা যে ভক্তির কথা বলি, দর্শনাদির কথা বলি, এর সঙ্গে রিলেটেড অনেক কিছু থাকে। যেমন, যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন, অনেকে আছেন দিনে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা জপধ্যান করেন। শুধু জপধ্যানে হয় না, তার সঙ্গে রিলেটেড অনেক কিছু করতে হয়। প্রথম হল, আপনার ইমোশানস কি কন্ট্রোলে এসেছে? চটপট কোন কিছুকে ধরে নেওয়ার ক্ষমতা কি আপনার বাড়ছে? ঈশ্বরের দিকে মানুষ এগোচ্ছে কিনা তার একটা অন্যতম লক্ষণ হল, বুদ্ধি তখন খুব তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। লাটু মহারাজের জীবনী পড়ুন, লাটু মহারাজের কোন পড়াশোনা নেই, অত্যন্ত সাধারণ এক পরিবার থেকে তিনি এসেছেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিটা খুব তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর-একটি লক্ষণ, এনারা কুশল হয়ে যান; কাজ কিভাবে করতে হয় এনারা জানেন। এনারা ভাল করে জানেন, কোন কথা ঠিক, কোন কথা ভুল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এনাদের ইমোশানস পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তেমনি শাস্ত্রের কথাগুলো চটপট বুঝে নিতে পারার ক্ষমতা হয়ে যায়। এই ধরনের অনেকগুলো জিনিস রিলেটেড থাকে।

উল্টোপাল্টা কথা, হাভাতে কথা, উতলো কথা, এ-ধরনের কথা ওনারা আর বলেন না। একটু হয়ত মজা করতে পারেন; ঠাকুরও বাচ্চা মেয়েকে দেখে বলছেন—ওলো তোর খোপা বেঁধে দিই, তোর ভাতার এলে বলবে কি। ঠাকুর মজা করছেন, কিন্তু তাই বলে, তিনি ওই জায়গাতেই অবস্থিত থাকছেন না। এই জিনিসগুলিকে কোথাও আমরা মিস করে যাই। যাই হোক, এই হল এর ব্যাখ্যা। এরপর তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীযুক্ত মনোমোহন ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

তিন দিন পর ১৯শে নভেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, (পৃঃ ১০৯), সুরেন্দ্রে বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা, সুরেন্দ্র নিমন্ত্রণ করেছেন। তিন দিন পর এখান থেকে পুরো জিনিসটা একটু অন্য রকম হচ্ছে।

মনোমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুর বলিতেছেন, “যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিস। খোল মাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়”। ঠাকুর গ্রাম দেশের লোক, তাঁর উপমাগুলোও তাই বেশির ভাগই ছিল গ্রাম দেশের। গরুকে খড় দেওয়াকে জাব বলে। শুকনো খড় খায় ঠিকই, কিন্তু একটু খোল মিশিয়ে দিল গরু খুব খুশি হয়ে খায়। খোল হল, তিসি, সরষকে পিষাই করে যে তেল বার করা

হয়, সেই তেল বের হয়ে যাওয়ার পর যে অবশিষ্ট পড়ে থাকে সেটাকে তিসি হলে তিসির খোল, সরষে হলে সরষের খোল বলে। দুর্ঘোষন অত টাকা অত ঐশ্বর্য দেখাতে লাগল; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিদুরের বাটী গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বৎসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি ভক্তের পাছে পাছে যান।

এখানে দুটো স্তরে কথা চলছে। ঠাকুর বলছেন—যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিস। এই কথা দিয়ে ঠাকুর যে কাউকে গরীব হতে বলছেন, সেই অর্থে না। যাদের ধন-সম্পদ আছে, ঐশ্বর্য আছে, তাদের যে ভক্তি হয় না, তাও না। আমরা যে বস্তু নিয়ে থাকি, ব্যবহার করি, আমাদের চারিপাশে যত বস্তু আমাদের ঘিরে রেখেছে, তার একটা প্রভাব আমাদের মধ্যে পড়ে; এটাকে বলে তন্মাত্রা। তন্মাত্রার প্রভাব আমাদের সবারই উপর পড়ে। গান্ধীজী একবার মুসোলিনির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, মুসোলিনি গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ওয়েটিং রুমে যেখানে গান্ধীজীকে দাঁড় করানো হয়েছে, সেখানে দেখছেন চারিদিকে তলোয়ার, বন্দুক, নানা রকমের অস্ত্র রাখা আছে। গান্ধীজী তখন খুব ভদ্র ভাবে বলছেন, ‘মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করার জন্য এগুলো করা হয়েছে। জেনেগুনেই করা হয়েছে। অথচ যার কাছে এগুলো আছে, সে মনে করবে আমার বিরাট শক্তি’। টাকা-পয়সা খুব বেশি হয়ে গেলে, মন তখন স্বাভাবিক ভাবেই ঐশ্বরের দিকে যাবে। যে গরীব, তার মধ্যে ঐশ্বরের জন্য যে রজোগুণ আসে, সেটা থাকে না।

কিন্তু তার থেকেও যেটা বেশি হয়, যার কথা এখানে বলছেন, যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিস। বাচ্চা যখন জগৎ থেকে মার খায় তখন সে তার মার কাছে দৌড়ে যায়। কিন্তু মা যখন তাকে মারে, তখন বাচ্চা কার কাছে যাবে? তখন সে মাকে আরও বেশি জড়িয়ে ধরে। ঈশ্বর আর ভক্তের ঠিক এই সম্পর্ক। ভক্ত যখন নিঃসম্বল হয়ে যায়, তার মানে সে জগৎ থেকে মার খেয়েছে, সে তখন ঈশ্বরকেই আঁকড়ে ধরে, কারণ ঈশ্বর ছাড়া তার আর কোন সম্বল নেই। এরপরেও যদি তার জীবনে কষ্ট আসে, তার তো আর কোথাও যাওয়ার নেই, সে তখন ঈশ্বরকেই আরও আঁকড়ে ধরে, তাঁর ভিতরে আরও বেশি করে ঢুকে যায়। যতক্ষণ আমাদের support systemটা ঠিক থাকে, ততক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে আমরা supportএর দিকে চলে যাই। ঠাকুর কিন্তু এতে আপত্তি করছেন না। যেমন ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কটা রুটি খাও; তার মানে বুঝে নিতে চাইছেন মাসে কত আটা লাগবে, চাইছেন, সেই অনুসারে মায়ের একটা অর্থের সংস্থান যাতে তিনি করে দিয়ে যেতে পারেন। স্বামীজীও তাঁর মায়ের জন্য টাকার ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করেছেন। এগুলোতে দোষ নেই। তবে কি হয়, যারা গরীব কিন্তু ভক্ত, যারা সব রকম চেষ্টা করেও দেখল কিছুই হচ্ছে না, তখন সে ছেড়ে দেয়, ঠিক আছে, যা হওয়ার হবে। তার আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না।

একজন শিবের ভক্ত, খুব গরীব। পার্বতী শিবকে বলছেন, ‘আপনার এত বড় ভক্ত, কিন্তু খুব গরীব, ওর জন্য একটা কিছু করুন’। শিব বলছেন, ‘আমি করলেও ওর গরীবত্ব ঘুচবে না’। ‘না না, আপনি করে দেখুন’। ভক্তটি একদিন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। শিব একটা থলে ভর্তি টাকা রাস্তায় রেখে দিলেন, যাতে তাঁর ভক্ত দেখতে পেয়ে নিয়ে নেয়। কিন্তু এমনই কপাল যে, এই ঘটনার ঠিক আগে ভক্তটির মনে হল, আচ্ছা আমি ঈশ্বরের উপর ঠিক ঠিক নির্ভর করে আছি কিনা দেখা যাক। আমি চোখ বন্ধ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব, দেখি ভগবান আমাকে গন্তব্যের জায়গায় নিয়ে যান কিনা। ভক্তটি চোখ বন্ধ করে চলতে লাগল। ফলে যেখানে টাকার থলেটা রাখা ছিল, সেই জায়গাটা চোখ বন্ধ করে পেরিয়ে গেল। গন্তব্যে পৌঁছে গিয়ে খুব খুশী, ‘হে প্রভু আপনি আমাকে একটাও হেঁচট খেতে দিলেন না’। এই গল্পটা বলা এই জন্য যে, ভক্তের কিছু আছে, কি কিছু নেই, তাতে তার কোন ভ্রমক্ষেপ নেই, সে সব কিছুতে নির্ভর করে আছে ঈশ্বরের উপর।



ঠাকুরও ছোট শিশু আর মায়ের উদাহরণ প্রচুর দিতেন। ছোট শিশু যেমন সব সময় মায়ের উপর নির্ভর করে থাকে, ভক্ত ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যারা বড়লোক, প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, অনেকের সাথে সম্পর্ক আছে; এদের কোন সমস্যা হলে এরা ওই পাঁচটা দিকেই হাত বাড়ায়। যার কিছু নেই, সে আরও ঈশ্বরের দিকে যায়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দেশে মহামারী, অনাবৃষ্টি, বন্যা কিছু হলে বলত, ঠাকুর যা করবার করবেন। এখন দেশের পয়সা হয়েছে, ক্ষমতা হয়েছে, এই করোনা কালেই আমরা দেখেছি সরকার দেশের লোকদের জন্য কত কিছু করেছে। এটা বলা হচ্ছে না যে, ওটা ভাল, এটা খারাপ। বলতে চাইছি যে, যে ঠিক ঠিক ভক্ত, সংসার থেকে যার সত্যিকারের কোন প্রত্যাশা নেই, সে তখন এসব নিয়ে ভাবতে যায় না। কারণ তার পক্ষে এখন আর এটা সম্ভব না। নিজের মনটাকে সংসারের দিকে, সংসারে যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে, এসবের দিকে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না, সে অত সময়ও দিতে পারে না।

ঠাকুর যে দুর্ঘোষণা আর বিদুরের ঘটনা বলছেন, মহাভারতের এটি একটা নামকরা কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ চাইছিলেন দু-পক্ষের মধ্যে আলোচনা করে সব কিছু মিটমাট করে দিতে, যাতে যুদ্ধটা আটকানো যায়। তিনি হস্তিনাপুর এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দুর্ঘোষণা নিজের ঘরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন, ‘দেখ কারুর আশ্রয় সেখানেই নেওয়া যায়, যেখানে হৃদয়তা আছে, যেখানে প্রয়োজন আছে, আশ্রয়প্রার্থী কোন বিপদে আছে, ইত্যাদি’। উনি পরপর দেখালেন মানুষ কখন কোন কোন পরিস্থিতিতে একজনের আশ্রয় নেয়, যার কোনটাই আমার আর তোমার মধ্যে নেই। উনি বিদুরের ঘরে গেলেন, সেখানে কুন্তীও আছেন; মহাভারতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। এখানে ঠাকুর ভক্তির দিক থেকে বলছেন। দুর্ঘোষণার ঐশ্বর্যের দিকে না গিয়ে বিদুরের ভক্তির দিকে গেলেন।

ঠাকুর গান করছেন – যে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে, ইত্যাদি।

“চৈতন্যদেবের কৃষ্ণনামে অশ্রু পড়ত”। সত্যিকারের কেউ যদি ওই স্তরে চলে যান, সেই গভীর অবস্থায় চলে যান, একটু অদর্শনে চোখ ছলছল করে ওঠে। “ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মানুষ মনে করলে ঈশ্বরলাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতেই মত্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে”। ঠাকুরের খুব নাককরা কথা। প্রচলিত কথায় বলে সাপের মাথায় মণি থাকে, অন্য দিকে সাপ ব্যাঙ খায়। তাহলে প্রশ্ন আসবে, তাহলে সাপ কি খাবে, ব্যাঙ ছেড়ে কি মণি খাবে? এই কথা ঠাকুর বোঝাবার জন্য বলছেন। যেমন বিদ্যাসাগরের নামে বলছেন, ভিতরে সোনা চাপা আছে, কিন্তু খপর নাই। ঠিক তেমনি, মাথায় মাণিক রয়েছে, তবুও সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।

ঠাকুর বলছেন, মানুষ মনে করলে ঈশ্বরলাভ করতে পারে। তাহলে আমরা ঈশ্বরলাভ করতে পারি না কেন? ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিচ্ছেন, মানুষ কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে মত্ত। খুব সাধারণ মনের জন্য এই কথা বলছেন। যোগের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, আমাদের পাঁচ রকমের ক্লেশ আসে, আর তার সাথে মনে পাঁচ রকমের বৃত্তি আসে। ক্লেশের মধ্যে রাগ আর ঘেঁষ আছে –কিছু জিনিসের প্রতি আসক্তি আর কিছু জিনিস থেকে আমরা সরে আসতে চাই। এর পিছনে রয়েছে আমাদের মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তিগুলি – প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

প্রমাণ হল, যেগুলো আমরা ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে পাই। বিপর্যয় ও বিকল্প হল কল্পনা ও মিথ্যা জ্ঞান; নিদ্রা হল স্বপ্ন, স্মৃতি হল পুরনো কথা। যেদিন আপনি বললেন, আমি সাধনাতে নেমে গেলাম; তার মানে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে এলেন, মিথ্যা জ্ঞান যেগুলো, সেগুলো থেকে না হয় সাবধান হয়ে গেলেন; কিন্তু তারপরেও তিনটে জিনিস থেকেই যাবে –বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি; অর্থাৎ কল্পনা, স্বপ্ন আর পুরনো কথা, এই তিনটে জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আমাদের যে সাধনা, মূলতঃ এই তিনটে জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। মানুষ কামিনী আর কাঞ্চন এই তিনটির মধ্যেই জড়িয়ে আছে। যখন সে সাধনা করে, তখন এই সাধনার জন্য তাকে যে অনেক গভীরে যেতে হয়, তার

জন্য সে হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত হয়ে যেই সে সংসারে নামতে যায়, তার মানেই সে কামিনী আর কাঞ্চনে নেমে গেল। তেমনি স্বপ্নে কিছু সুখকর জিনিস, কামের ভাব আসতেই পারে। আর স্মৃতি, পুরনো কিছু কথা, যেগুলি আপনি শুনেছেন বা কিছু ঘটনা দেখেছেন, সুখ-দুঃখের কিছু অনুভব হয়েছে, এই স্মৃতিগুলি সাধকের মনে আশুন জ্বালিয়ে দেয়।

রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বর্ণনা আছে। তাতে দেখা যায়, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তাঁর বাবা এমন ভাবে ছোটবেলা থেকে ট্রেনিং দিয়েছেন যে, মুনির ভিতর বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি এগুলো কিছু নেই। অঙ্গ দেশের রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসার জন্য কিছু নর্তকী পাঠিয়েছিলেন। নর্তকীরা পুরুষ-সাধুর বেশে মুনির আশ্রমে গেছে। মেয়েদের চেহারার মধ্যে অন্য একটা ভাব থাকে। পুরুষ সন্ন্যাসীর পোশাকে থাকলেও ওই ভাবটাকে চাপা দেওয়া যায় না। যাই হোক, ওদের ওই কোমল চেহারা, চোখের চাহনিটা দেখেই ঋষ্যশৃঙ্গের মনে কি একটা হতে শুরু হল, তাঁর খুব ভাল লাগতে শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর যে কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন, তাতে এই সমস্যাটাই হয়। আশুন আর ইন্ধন পেট্রলের মত, একটু কেউ কাছে এলে জ্বলে ওঠে। কেউ এটাকে বলে জেনেটিক, কেউ বলে পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকে টেনে নিয়ে আসে।

আমরা যখন জপধ্যানে বসি, তখন কামিনী কাঞ্চন আমাদের সামনে অনেকগুলো রূপে আসে। শুধু যে কামিনী-কাঞ্চনের রূপ নিয়ে আসে তা না; নামযশটাও একই রূপ, যেখানে মানুষ সংসারে নিজের বিস্তার করতে চায়। কামিনী-কাঞ্চন হল নিজের বিস্তার, আসলে কামিনী জিনিসটাই আসল, কাঞ্চন এমন কিছু না; কারণ কামিনীর জন্যই কাঞ্চন দরকার পড়ে। কামিনী নেই অথচ টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে, এরা মানসিক রোগী। সাধারণ ভাবে কোন না কোন ভাবে দৃষ্টি কামিনীর দিকে থাকলে, তবেই সে কাঞ্চনের দিকে যাবে। আর নামযশ থেকে কেউ বেরোতে পারে না। কামিনী আর নামযশ, এই দুটোই কিন্তু নিজের যে ব্যক্তিত্ব, নিজের আমিত্বের প্রসার করার জন্য। আসলে মানুষ মরতে চায় না, যত জিনিসের সাথে সে নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছে, তত সে নিজেকে মনে করে তার স্থিতি আছে।

কিন্তু ঠাকুর আমাদের এগুলো থেকে বার করে আনার জন্য বারবার বোঝাচ্ছেন। তখনকার দিনে সমাজের লোকেরা অনেক ভাল ছিল, বর্তমান যুগের মত সেই যুগে এত exposure ছিল না। কিন্তু আজকের সমাজে প্রচুর exposure এসে গেছে, ইন্টারনেট আছে, টেলিভিশন আছে, আর তাতে যেসব জিনিস ভেসে আসে, আমরা তো অত কিছু দেখি না বলে কোন রকমে বেঁচে যাই, কিন্তু এখানে সেখানে যাওয়ার সময় চোখে এক আধটা দৃশ্য পড়ে যায়, দেখে আমরা সন্ন্যাসীরা কেমন একটা আঁতকে উঠি। সমাজের লোকদের এতে কি হয়, desensitize হয়ে যায়, দিনরাত এটাতেই আছে বলে ছাপ ছাড়ে না। কিন্তু যেমনি জপধ্যানে নামবেন, তখন আস্তে আস্তে এগুলো থেকে সরে আসতে হয়, নিজেই সরে যায়। ফলে কি হয়, তখন যেগুলো desensitize ছিল, সেটা এখন sensitise হয়ে যায়, তখন আবার মনটাকে টেনে ওই দিকে নিয়ে চলে যায়। সেইজন্য থিয়োরটিক্যালি খুব সোজা, কিন্তু প্র্যাক্টিক্যালি যখন নামে, তখন খুব কঠিন হয়ে যায়।

**ভক্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে। আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য অত জানবার কি দরকার? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই গুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, সে খবরে আমার কি দরকার? একঘটি জলে আমার তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে, সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।** ঠাকুর অনেকগুলো কথা বললেন, তার মধ্যে এটাও বলছেন। আসলে এই জগৎ হল ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা, ঈশ্বর আর ঐশ্বর্যের খেলা। আমাদের পূর্বজরা, ঋষিরা প্রথম থেকেই বলে গেছেন—হয় ঐশ্বর্যের দিকে যাও, নয়তো ঈশ্বরের দিকে যাও। ঐশ্বর্যের দিকে যদি যাও, তাহলে নির্লিপ্ত থাক। ঈশ্বাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলছেন, ঈশ্বরজ্ঞানে সমস্ত কিছুকে ত্যাগ কর। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন—*ন কর্ম লিপ্যতে নরে*, ঐশ্বর্যের দিকে যদি যাও, লিপ্ত হয়ো না। ব্রহ্ম আর শক্তি,

হয় ব্রহ্মের দিকে যাও, নয় শক্তির দিকে যাও। শক্তির দিকে যদি যাও, নির্লিপ্ত থাকবে। সমস্যা হল, নির্লিপ্ত থাকা যায় না। লোকে বলে, আমি নির্লিপ্ত থাকতে পারি বা আমি নির্লিপ্ত আছি, এটা হয় না। আমরা মনে করি, আসলে কিন্তু এটা হয় না। অবতার জ্ঞানভক্তি শেখাতে আসেন। সংসার মানেই ঐশ্বর্যের জায়গা, ঐশ্বর্যের কথা অবতাররা বলা তো দূরের কথা, ওখান থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সেইজন্য এই ধরণের কথা ঠাকুর বারবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সুরেন্দ্রের বাড়িতে আসিয়াছেন। আসিয়া দোতালার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্রের মেজোভাই সদরওয়াল্লা, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভক্ত ঘরে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রের দাদাকে বলিতেছেন, “আপনি জজ, তা বেশ; এটি জানবেন সবই ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। লোকে মনে করে আমরা বড়লোক; ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটা মুখ দিয়ে জল বার কচ্ছে। কিন্তু দেখ কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে পড়ছে, তারপর গড়িয়ে নলে যাচ্ছে, তারপর সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে”।

অনেক আগেকার ঘটনা। একজন রাজনীতিবিদ ক্ষমতায় আছেন, একেবারে অশিক্ষিত। মুর্খ নেতা ক্ষমতায় থাকা মানে, তার অধীনে সব আইএএস, আইপিএস। আমি একটা মন্তব্য করেছিলাম—হে সাধক! কর্মের গতি অতি আজব, কর্ম মুর্খকে রাজা করে, পণ্ডিতকে ভিখারী করে দেয়। আমার এক বন্ধু, খুব বিচক্ষণ লোক, তিনি আমাকে এই কথাটা বলেছিলেন, ‘ঠাকুরও বলেছিলেন সময় না হলে হয় না’। আমরা এগুলোকে এত পড়েছি, মন্থন করেছি, কিন্তু কি হয়, যখন সময় আসে তখন একটা সাধারণ কথা দিয়ে পুরো জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যিনি আমাকে বলছেন, তিনি একজন বড় অফিসার ছিলেন, তিনি আমাকে বলছেন—‘দেখুন স্বামীজী যিনি একজনকে আইএএস, আইপিএস বানিয়েছেন, তিনি সেই মুর্খকে রাজা বানিয়েছেন’। উনি বললেন, আমি শুনলাম, সাথে সাথে আমার মনটা এই ব্যাপারে চিরদিনের জন্য শান্ত হয়ে গেল। আমরা যখন সমাজের দিকে তাকাই, আমরা বলি যে, এত দুষ্ট লোক, এত বদমাইশ লোক কিন্তু এদের এত ক্ষমতা কেন? তিনিই ক্ষমতা দিয়েছেন।

এই যে বলছিলাম যখন সময় হয় তখনই শিক্ষা হয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৯৫ সাল, তার মানে কতদিন আগেকার কথা। সেই সময় আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলাম, স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, বর্তমানে যিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট, তিনি তখন সেখানকার সেক্রেটারী ছিলেন। আমাদের স্কুল খুব নামকরা স্কুল, ভারতে CBSEর প্রথম দশটি স্কুলের মধ্যে নাম, র‍্যাঙ্কিংএ থার্ড কি ফোর্থ হবে, যেটা সত্যিই বিরাট ব্যাপার। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের উপর ওপর মহল থেকে প্রচুরে প্রেসার আসে। চীফ মিনিস্টার, মিনিস্টার, এমপি, এমএলএ, এসপি, ডিআইজি এদের প্রেসার সামলাতেই আমাদের দম বেরিয়ে যেত। তখন ইউনাইটেড বিহার, সেখানকার একজন মিনিস্টার, অন্যদিকে বিরাট বড় ক্রিমিনাল; কাউকে ভর্তি করার জন্য প্রচুর প্রেসার দিচ্ছিল। তাকে নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছিল। সারাদিন পাটনা থেকে ফোন আসতেই থাকে, ডিএম, এসপি এসে বসে থাকে। যাই হোক, একটা যোগাযোগ হতে শুরু হল। ওই ভদ্রলোক নিজেই আশ্রমে এসেছেন। সুহিতানন্দজীর শরীর খুব কম খারাপ হত। কিন্তু কপাল এমন, ওই দিনই মহারাজের জ্বর ছিল। মিনিস্টার এসেছে, শুনলেন। একেই শরীর খারাপ, এমনিতেই এই ঘটনাগুলিতে তিনি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, আমারও খুব বিরক্ত লাগছিল। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারীর অফিসে ওনাকে বসানো হয়েছে, মহারাজ ওনাকে ঠিক এই কথাই বললেন—“আপনি যে এত বড় নেতা, এত বড় মন্ত্রী, মনে রাখবেন এটা ঈশ্বরই আপনাকে দিয়েছেন। যদি এর দুর্ব্যবহার করেন, ঠিক ভাবে উপযোগ না করেন, যিনি এই ক্ষমতা আপনাকে দিয়েছেন, তিনি এই ক্ষমতা আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন”। ঠাকুর এখানে এটাই সুরেন্দ্রের

মেজোভাইকে বলছেন – বড় পদ তিনিই দিয়েছেন। এরপর আপনি যদি এলেমেলো করেন, তিনি ওই পদ নিয়ে নেবেন। সংসার তাঁর, কি ভাবে চালাবেন তিনি ঠিক করে রেখেছেন।

মহারাজের এই কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। কারণ আমি ১৯৭২ সাল থেকে সুহিতানন্দজীকে কাছ থেকে দেখেছি, ওনার আমি ছাত্র ছিলাম, ওনার কাছে শিক্ষা পেয়েছি, বড় হয়েছি, মানুষ হয়েছি। আমি দেখেছি, কাউকে যদি উনি কিছু বলে দেন, ওটা হবেই হবে। আজ পর্যন্ত তাঁর একটি কথা অন্য রকম হতে দেখিনি। তাঁর কদিন পরেই ভোট ছিল। ভদ্রলোক বিহারের এত নামকরা নেতা, মাত্র তিনশ ভোটে হেরে গেল। পরে আমি মহারাজকে মজা করে বললাম – ‘মহারাজ দেখলেন তাই হল’। আমার কথাতে উনি বাচ্চার মত হাসছেন। মহারাজ ওই অর্থে বলেননি যে, আপনাকে অভিশাপ দিলাম, আপনি এবার শেষ। সরল মনে মহারাজ একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে ভদ্রলোকের কানে তুলে দিলেন – ক্ষমতার যদি দুর্ব্যবহার করেন, যিনি দিয়েছেন তিনি নিয়ে নেবেন। ক্ষমতাবান নেতাদের আশ্ফালন, অন্যদের তুচ্ছ ভাবা, চুরি, দুর্নীতি এগুলো আমরা যখন দেখি, তখন ভুলে যাই যে তিনিই দিয়েছেন।

অনেক সময় মনে হয়, এর বিরুদ্ধে ফাইট করতে হবে, অবশ্যই করুন। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন, এগুলোতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে। এটাই ঠাকুর এখানে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এটাকে মাথায় রাখতে হবে। ক্ষমতা, শক্তি সবটাই ঈশ্বরের; মেঘের জল ঘুরে ঘুরে যেভাবে আমাদের কাছে আসে, ঈশ্বরের সেই শক্তিও ঘুরে ঘুরে আমাদের কাছে আসে। কাউকে রাজা বানায়, কাউকে পণ্ডিত বানায়, কাউকে অন্য কিছু বানায়। আমরা যে বলি, *পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্*, সেখানে বলা হচ্ছে তিনি সাধারণকে বড় করছেন। তাঁর রাজ্যে কেউই সাধারণ নয়, ভগবানের সৃষ্টিতে কেন কেউ সাধারণ হবে! ভগবানের সৃষ্টিতে সবাই ভগবানের সন্তান। ভগবানের কেউ প্রিয় না, কেউ অপ্রিয় না। গীতায় ভগবান বলছেন, *ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ*। তিনি কাউকে এই ক্ষমতা দিয়ে বড় করেন, কাউকে ওই ক্ষমতা দিয়ে বড় করেন; আমাদের সমস্যা হয়, আমরা ভাবি আমার কাছে এই ক্ষমতা নেই কেন। মাথায় আমাদের মণি, কিন্তু সাপের মত ব্যাঙ খেয়ে মরছি। আমার মাথায় যে মণি, সেই ব্যাপারে আমার কোন চেতনা নেই। অপরে যেটা করছে, সেটাকে নিয়ে আমি ছটফট করছি – আমার বাড়ি নেই কেন, আমার গাড়ি নেই কেন, আমার টাকা-পয়সা নেই কেন; এটাই হল সাপের মরা ব্যাঙ খেয়ে মরা। সাধুরা বলবেন, আমার ক্ষমতা নেই কেন, আমার কাছে পাঁচজন লোক আসে না কেন, আমার ভক্ত নেই কেন, ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুর আপনাকে অন্য কিছু দিয়ে রেখেছেন, ওটার ব্যাপারে আপনি যখন সচেতন হবেন, ওটার দিকে যখন এগোতে শুরু করবেন, তখন আপনার চেতনা আসবে যে, আমার মাথায় মণি আছে।

**সুরেন্দ্রের ভ্রাতা – মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা; জাতিভেদ উঠিয়ে দাও; এ-সব ব্যাপারে কি বোধ হয়?** মাঝে মাঝে হিন্দু সমাজে সংস্কারের আন্দোলন হয়, হিন্দুদের এটা প্রচুর হয়, রেনেশাঁ যখন হয়েছিল তখন খ্রীশ্চানিটিতেও প্রচুর আন্দোলন হয়েছে, খ্রীশ্চানিটি এত বেশি রিফর্ম করতে শুরু করে দিল যে, ভগবানকেই তুলে ফেলে দিল। আগেকার মানুষ ভগবানকে ক্রুশবিদ্ধ করে দিল, এখনকার মানুষ কলম দিয়ে ভগবানকে ক্রুশবিদ্ধ করছে। মানুষ জাতি এমন, ভগবানকে না মেরে ছাড়বে না। কখন সরাসরি ক্রুশবিদ্ধ করে, কখন পেন দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে। যত লিবারালরা আছে, থেকে থেকে ভগবানকে ক্রুশবিদ্ধ করে যাচ্ছে। যাঁরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তারাই এখন পেন দিয়ে ভগবানকে ক্রুশবিদ্ধ করে যাচ্ছে। ধর্মের দোষগুলিকে টিপ করতে গিয়ে ভগবানকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেইজন্য বিধবা বিবাহ হবে কিনা, জাতিপ্রথা থাকবে কিনা, এগুলোকে নিয়ে দিনরাত চর্চা করতে থাকবে।

**শ্রীরামকৃষ্ণ – ঈশ্বরের উপর নূতন অনুরাগ হলে ওইরকম হয়।** একটা চেতনা যখন আসে, নিজের স্বার্থপরতা থেকে মানুষ যখন বেরিয়ে আসে তখন এগুলো আসে। **ঝড় এলে ধুলো ওড়ে, কোন্টা আমড়া, কোন্টা তেঁতুলগাছ, কোন্টা আমগাছ বোঝা যায় না। ঝড় থেমে গেলে, তখন বোঝা যায়।**

নবানুরাগের ঝড় থেমে গেলে ক্রমে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরই শ্রেয়ঃ নিত্যপদার্থ আর সব অনিত্য। সাধুসঙ্গ তপস্যা না করলে এ-সব ধারণা হয় না। এই বাক্যটা খুব দামী—সাধুসঙ্গ তপস্যা না করলে এ-সব ধারণা হয় না। আপনার যে exclusive existence, ‘আমি ও আমার’ এই বোধ নিয়ে আছেন, সাধুসঙ্গ না হলে আপনি এই বোধ নিয়েই থেকে যাবেন। আর কোন কারণে চেতনা যদি একটু জাগে, তখন আবার দরিদ্র কাঙালীদের খাওয়াচ্ছি, নানারকমের সমাজের এটা সেটা করছি। কিন্তু আমাদের যে দায়িত্ব, সেটা এগুলো থেকে অনেক বেশি। যার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যে ঠাকুরের কথোপকথন হয়েছিল; সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণা, দান; বিদ্যাসাগরের যে খুব ইচ্ছে সমাজের ভাল করা, এই প্রসঙ্গগুলি উঠলই না; ঠাকুর এগুলোর বাইরে দিয়ে আলোচনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা সাধু কি, সঙ্গ কি, এ-সবের ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। আমাদের অনেক সময় শুনতে হয়, ‘আপনাদের মত অনেক সাধু দেখেছি’। আমিও বলি, ‘গেরুয়া যতক্ষণ পরে আছে ততক্ষণ সবাই সাধু। পুলিশ যত দুর্নীতিপরায়ণ হোক, যত অপদার্থ হোক; কিন্তু যখনই পুলিশের পোশাকে একটা ডাঙা নিয়ে রাষ্ট্রীয় দাঁড়াবে, তখন ওর কাছে সমস্ত ক্ষমতা থাকে’। গেরুয়া পরে যে সাধু আছেন, সমস্ত হিন্দু ধর্মের যে পরম্পরা, তিনি তখন তার প্রতিনিধি। সাধু কখন ছোট বড় হয় না। কেউটে ছোট হোক আর বড় হোক, কেউটে কেউটেই। যারা এই প্রশ্নগুলি করতে থাকে, তাদের কোন দিন ধর্ম, অধ্যাত্ম কোনটাই হয় না। যখনই সাধুসঙ্গ হয়, তপস্যা করা হয়, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, তখনই এগুলো ঠিক ঠিক ধারণা হয়।

পাখোয়াজের বোল মুখে বললে কি হবে; হাতে আনা বড় কঠিন। শুধু লেকচার দিলে কি হবে, তপস্যা চাই, তবে ধারণা হবে।

জাতিভেদ? কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অম্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়—চণ্ডাল ভক্ত হলে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন। বিষয়ের বাইরে একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। গিল্ড, অর্থাৎ যারা একটা পেশা নিয়ে আছে, এটা প্রত্যেক সমাজেই থাকে। সম্পদ যখন সীমিত থাকে, তখন কাজ বন্টন করে দিতে হয়। সমাজে সব কিছুই দরকার পড়ে। সাবমেরিনে একজন কমাণ্ডারও আছে, আবার সাধারণ কাজ করার জন্য লোকও আছে। কিন্তু সাবমেরিনে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ, একজন যদি কাজে গোলমাল করে বসে, তাহলে সবাইকে মরতে হবে। জাতি অনেকটা তাই।

এখানে ঠাকুর শব্দটা বলছেন ‘জাতিভেদ’, সমস্যা ‘জাতি’কে নিয়ে হয় না, ‘ভেদ’টাকে নিয়ে সমস্যা হয়। ‘ভেদ’ ভাব থেকেই ধীরে ধীরে মানুষ প্রিভিলেজ নিতে শুরু করে। কিছু দিন আগে একটা লেখা পড়ছিলাম, সেখানে বলছেন, স্বাধীনতার পরে আগেকার রাজনৈতিক নেতারা দেশের জন্য ছিলেন। এখন যাঁরা রাজনীতিতে আছেন, বেশির ভাগই নিজের স্বার্থের জন্য, তার মানে প্রিভিলেজ নিতে শুরু করে দিয়েছেন। শঙ্করাচার্যকে ভগবান শিব দেখিয়ে দিলেন, চণ্ডাল চণ্ডাল না। কবীর দাস এবং আরও মহাপুরুষরা যাঁরা এসেছেন, চিরদিনই তাঁরা জাতিপ্রথার বিরোধিতা করতেন। কিন্তু তাই বলে কি সমাজে জাতির যে কাজ করে সেই কাজ হবে না? অবশ্যই কাজ হবে, ওই ভেদ যেটা, সেটাকে আটকাতে চাইছেন। জাতি জিনিসটা সমাজ তৈরী করে, সমাজ বলে দেয় তুমি মুচির কাজ করবে, তুমি কাঠের কাজ করবে। আর ভেদ জিনিসটাও সমাজ নিয়ে আসে, এর মধ্যে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। হিন্দুদের যে পুরো জাতিপ্রথা, এর মধ্যে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। এখানে জাতি একটা সামাজিক ব্যবস্থা, বর্ণ একটা সামাজিক ব্যবস্থা; এর সমস্যাটাও সামাজিক।

যদি এটা ধর্মের সমস্যা হত, তাহলে ব্রাহ্মণদের স্বর্গ অন্য হত, ক্ষত্রিয়দের স্বর্গ অন্য হত, বৈশ্য ও শূদ্রদেরও স্বর্গ আলাদা আলাদা হত; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের কোথাও বলা হচ্ছে না যে, তোমার স্বর্গ আলাদা, ওর স্বর্গ আলাদা। যেমন মুসলমানরা বলে, মুসলমানদের জন্য স্বর্গ একেবারে নির্দিষ্ট করা

আছে। আর মুসলমানদের দৃষ্টিতে হিন্দুদের জাহান্নমের জায়গা নির্দিষ্ট রয়েছে। তার মানে মুসলমানদের স্বর্গ আলাদা, আর হিন্দুদের মৃত্যুর পরে যে স্থানে যাবে সেটা আলাদা। জাতিতে এটা কক্ষণ হয় না, হিন্দুরা কক্ষণ বলে না, কারণ এটা ধর্মের সমস্যা না, সমাজের সমস্যা। এখন অবশ্য এই কথাগুলোর কোন দাম নেই, কারণ জাতিপ্রথা উঠে গেছে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স আছে, এমএ এমএসসি ইন যোগ, সেখানে সব জায়গার ছেলেরা এসে ভর্তি হচ্ছে। এমনকি মুসলিম ছেলেও আছে, খুব ভাল ছেলে, আমার ক্লাশে পুরো ঈশোপনিষদ মুখস্ত করে নিয়েছে, যোগসূত্র পুরো মুখস্ত। আমাদের যে এমএ সংস্কৃতির কোর্স আছে, সেখানে কদাচিৎ কখন একজন কি দুজন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে আসে, বেশির ভাগই গ্রামের অত্রাঙ্কণ ছেলে। এখন জাতিপ্রথা উঠে গেছে। বিয়ের সময় কেউ কেউ জাতিটা দেখে, আর সব ক্ষেত্রে উঠে গেছে। কিন্তু তখনকার দিনে সমস্যা ছিল। এখন যে জায়গাতে ভক্তি আসে, সেখানে আর কোন জাত থাকে না। উৎসবের সময় বা এমনি দিনে বেলুড় মঠে যখন সবাই প্রসাদের লাইনে দাঁড়ায়, সেখানে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে না, আপনি কোন জাতির বা কোন বর্ণের। সন্ন্যাসীরা যাঁরা আছেন, কেউ তাঁরা আলাদা করে কিছু দেখেন না। চৈতন্যদেবের ভক্তরা ঠিক এ-ভাবেই ছিলেন, সবাই মিলে এক।

**ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর কৃপা হবে, ঈশ্বরলাভ হবে।**

সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এই ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন একঘাটের জল হিন্দুরা খায়, বলে জল; আর-একঘাটে খ্রীষ্টানরা খায়, বলে ওয়টার; আর-একঘাটে মুসলমানরা খায়, বলে পানি। আমরা আগেও এই কথা পেয়েছি, সেখানে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি।

**সুরেন্দ্রের ভ্রাতা –মহাশয়, থিওজফি কিরূপ বোধ হয়?** আমি যখনই এই বাক্যটা পড়ি, এখনও হাসি পায়। পড়াশোনা করা লোক, একজন জজ, সবই আছে আর তাঁর ভাই সুরেন্দ্র ঠাকুরের এত বড় ভক্ত, কিন্তু ভদ্রলোক টিপিক্যাল শহুরে লোক, নিউজপেপার পড়ছেন, এই করছেন, সেই করছেন, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা থিওজফি জিনিসটা কি। আমাদের অনেক সময় এসে জিজ্ঞেস করে, ওর ব্যাপারে আপনার কি মত? এটা কি আমার কাজ, আমার যে মত সেটাকে নিয়ে জিজ্ঞেস করুন।

একটা ঘটনা শুনেছিলাম। প্রভু মহারাজ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তখন অধ্যক্ষ ছিলেন। একবার দক্ষিণ ভারতের কোথায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। দীক্ষা দেওয়ার পর তিনি ভক্তদের জিজ্ঞেস করলেন কোন প্রশ্ন আছে কিনা। একজন ভক্ত বলছেন, ‘আচ্ছা শ্রীঅরবিন্দের যে দর্শন, এই ব্যাপারে আপনার কি মত?’ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ, একজন ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে আপনি শ্রীঅরবিন্দের মতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন? তারপর থেকে ঠিক হয়ে গেল, ভক্তদের যা প্রশ্ন আছে আগে সেবকদের বলে দিন, তাঁরা ঠিক করবেন কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। প্রশ্ন করার জন্য একটা পাত্রতা লাগে। আমরা এখানে ইউটিউবে ক্লাশ নিচ্ছি, কমেন্ট বক্সে দেখুন কত রকম কমেন্টস আসছে। বেশির ভাগ প্রশ্নই খাপছাড়া, এলেমেলো। যেটা বলা হচ্ছে সেটা আগে ভাল করে মন দিয়ে শুনুন, শুনে আগে মনটাকে তৈরী করুন। ঠাকুর এবার উত্তর দিচ্ছেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ – শুনেছি নাকি ওতে অলৌকিক শক্তি হয়। দেব মোড়লের বাড়িতে দেখেছিলাম একজন পিশাচসিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। থিওজফি আর পিশাচের কোন সম্পর্ক নেই, ঠাকুর জানেন না, জানার কথাও না; অল্পস্বল্প কোথাও শুনেছেন। এ্যনি বেসান্তের একটু সম্মান ছিল, কিন্তু তাঁর আগে যে ম্যাডাম ছিলেন, পরের দিকে দেখা গেল উনি ভূত, প্রেত নিয়ে অনেক প্রতারণা করতেন। সবটাই ফ্রড ছিল; কায়দা করে লোকেদের বোকা বানাত।**

**অলৌকিক শক্তি দিয়ে কি করব? ওর দ্বারা কি ঈশ্বরলাভ হয়? ঈশ্বরলাভ যদি না হল তাহলে সকলই মিথ্যা।** এই যে বলছেন, ঈশ্বরলাভ যদি না হয়, তাহলে সকলই মিথ্যা, আমরা যে জায়গাটা শুরু

করলাম, সেই জায়গাটা বলছেন। ঠাকুরকে দেখে ছোকড়া ব্রাহ্মভক্ত বলছে, ‘ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই’, আর ঠাকুর বলছেন, ‘তা আর হয়েছে’, এক দিকে ‘তা আর হয়েছে’ অন্য দিকে অন্যান্য জিনিসগুলো রয়েছে সেইদিকে বারবার ঠাকুর এটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছেন। এই ব্যালেন্সটাকে যে বোঝা, এটা পুরোপুরি নির্ভর করে নিজের উপরে।

একদিকে যেখানে মানুষ খেলো, কিন্তু বলছে, ‘যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই’। ঠাকুর বলছেন, ‘তা আর হয়েছে’। অন্য দিকে সুরেন্দ্রের ভাই একজন জাজ, তিনি একটু অন্য দিকে যাচ্ছেন, থিওজফি কি, ব্রাহ্মসমাজের কাজগুলো আপনার কেমন মনে হয়, জাতিভেদ কেমন মনে হয়; ঠাকুর সেটাকেও আটকে দিচ্ছেন। ঠাকুর তাঁকে আটকে দিয়ে বলছেন—ঈশ্বরের দিকে মন দাও। আর উতলো মন যখন বলছে, ঈশ্বরে মগ্ন হও, তাকেও আটকে দিচ্ছেন। প্রথমে শক্তি সঞ্চয় কর, শক্তি আসার পর ঈশ্বরের দিকে যাও। আমার বোল থেকে যে আম বেরোয়, সেই আম দিয়ে আচার হয় না। আম যখন পুষ্ট হয় তখন ওটা পাকার জন্য প্রস্তুত। পাকার পর ওই আম অনেক কাজে লাগবে। এমনকি ওর যে আঁটি হবে, মাটিতে পুতে দিলে নূতন আম গাছ হবে। আমরা হলাম বোল থেকে বেরিয়ে আসা ছোট্ট আম থেকে একটু বড় আম। এই আম এখন কোন কাজে লাগবে না, একটু আচার বা চাটনি করা ছাড়া এর কোন দামও নেই। ঠাকুরের এই কথাগুলোর মধ্যে দেখবেন, বলতে চাইছেন ভিতরে শক্তি সঞ্চয় কর। যখন বোঝা যাবে শক্তি সঞ্চয় হয়েছে; এরপর ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলোকে ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাও। এখানেই তৃতীয় পরিচ্ছেদ শেষ, এরপর চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ঠাকুর মণি মল্লিকের কলকাতা বাড়িতে ব্রাহ্মোৎসবে এসেছেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### মণি মল্লিকের ব্রাহ্মোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের সিন্দুরিয়াপটীর বাড়িতে ভক্তসঙ্গে এসেছেন। ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। (পৃঃ ১১০) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তরা আছেন, তার সাথে গৃহস্বামীর অন্যান্য বন্ধুরাও আছেন। ঠাকুর এসেছেন বলে মণিলাল ভক্তদের সেবার জন্য অনেক আয়োজন করেছেন। সবাই জানেন ঠাকুরের কাছে ঈশ্বরীয় কথা, ভক্তির কথা ছাড়া আর কিছু নাই। সেখানে কথক মহাশয় প্রহ্লাদচরিত্র-কথা বলছেন। ভাগবত ও মহাভারতে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে দেবতা আর অসুর দুজন ভাই। দুজনেরই বাবা কাশ্যপ মুনি, কিন্তু মা আলাদা। প্রথম থেকেই দেবতা আর অসুরদের মধ্যে রেষারেশি। শুধু এদের মধ্যেই না, কাশ্যপ মুনির আরও স্ত্রীরা ছিলেন, তাঁদের সন্তানদের মধ্যেও অনেক বিবাদ ছিল। ধীরে ধীরে দুটো দল হয়ে গেল—একটা দেবতাদের দল আরেকটা অসুরদের দল।

হিরণ্যকশিপু আসলে ছিল দৈত্য বংশের। দৈত্যরা ছিল দিতির সন্তান। দৈত্যদের বাবাও কাশ্যপ মুনি, দিতি তাঁর এক স্ত্রী। দিতি থেকে এসেছে দৈত্যরা, অদিতি থেকে এসেছে আদিত্য, অর্থাৎ দেবতারা। রেষারেশি থাকার জন্য দৈত্যরা চাইত না যে কেউ বিষ্ণুর উপাসনা করুক। ভাগবতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। হিরণ্যকশিপুও চান না, তাঁর ছেলে বিষ্ণুর উপাসনা করুক। অনেক গৃহী ভক্তদের বাড়িতেও এই জিনিস দেখা যায়। ‘কি সারাদিন ঠাকুর-ঠুকুর নিয়ে পড়ে আছ। কথামত পড়ে নিয়েছ, বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে, মাঝেসাঝে বেলুড় মঠে প্রণাম করে আসবে, এর বেশি কি দরকার’। এর বেশি এই কারণেই দরকার, ঈশ্বরদর্শনের দিকে এগোন, এটা পার্টটাইম কিছু না, এটা ফুলটাইম। পুকুরে মানুষ স্নান করতে যায়। পুকুরে মাছ থাকে, মাছ স্নান করে না, মাছ জলেই থাকে। যারা পুকুরের বাইরে থাকে, তারা মাঝে-সাজে স্নান করতে পুকুরে যায়, স্নান করে তার শরীর শীতল হয়। ধর্ম জিনিসটা মানুষের পুকুরে যাওয়ার মত না, ধর্ম জিনিসটা হল পুকুরে মাছ হয়ে থাকার মত। তাই যখনই সুযোগ হবে তখনই ঈশ্বরীয় কথা শোনা বা আলোচনা করা বা চিন্তন করা, এগুলোর মধ্যে

ডুবে থাকতে হয়। আমাদের অনেক সময় অনেকে বলেন যে, এত ব্যাখ্যা করার কি আছে। তাঁদের জন্য এটাই বলা যে, ব্যাখ্যা করারই বা কি দরকার, কথামৃত পড়ে নিই, হয়ে গেল। এমনি ভাবেও যদি ধর্মভাবে অনেকদিন থাকা যায়, তখন কারুর ব্যাখ্যা না শুনলেও নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠাকুরই গুরু, যখন দরকার পড়বে, তিনি ঠিক জানিয়ে দেবেন। নিজের ভিতর থেকেই উত্তরগুলো চলে আসবে। এরজন্য মনটাকে শুধু একটু শান্ত করতে হয়, মনকে একটু ধীর স্থির করতে হয়।

কথক মহাশয় বলছেন – পিতা হিরণ্যকশিপু হরির নিন্দা ও পুত্র প্রহ্লাদকে বারবার নির্যাতন করিতেছেন। প্রহ্লাদ করজোড়ে হরির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন আর বলিতেছেন, “হে হরি, পিতাকে সুমতি দাও”। ভাগবতে ঠিক এই বর্ণনা নেই, তবে এগুলো হল ভাবের কথা। ভাবের কথা কখনো ইতিহাসের কথা হয় না। মিটিংএ যেমন আমরা মিটিংএর কথাবার্তাগুলো রেকর্ড করে রাখি, এই ভাবের কথা জিনিসটা তা না। ভাগবত যিনি রচনা করেছেন, তিনি তাঁর ভাবে কিছু কিছু কথা বললেন। পরে পরে যাঁরা ভক্তির কথা লিখেছেন, তাঁরা নিজের নিজের কথা লিখেছেন। আমি যদি এই প্রহ্লাদ-চরিত্র রচনা করি, আমি আমার মত লিখব, সেটা কজন পড়বে, কজন পড়বে না, সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু আমি কখনই ব্যাসদেবের রচনা কপি করব না, জিনিসটা তো আগে থেকেই আছে। একজন কবি বা লেখক যখনই কিছু রচনা করেন, তিনি নিজের মত রচনা করেন। এখানে এই ভাব – হে ঠাকুর, তোমাকে ছেড়ে আমি তো থাকতে পারব না; তাহলে উপায় কি? বত্রিশটা দাঁতের মধ্যে জিহ্বার মত আমাকে থাকতে হবে। যে কোন মানুষ যখন বিষম পরিস্থিতিতে থাকে, বিপরীত অবস্থায় যখন থাকে, তখন বত্রিশটি দাঁত আর তার মধ্যে জিহ্বা যেমন নাচতে থাকে, একটু এদিক সেদিক হলে জিহ্বা দাঁতের কামড়ে কেটে যায়। প্রহ্লাদ ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছেন, ‘হে হরি, পিতাকে সুমতি দাও, এখন যে আচরণ করছেন, এই ধরণের আচরণ যেন না করেন’।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কাঁদিতেন। যাঁরা ঠাকুরের কথা একটু পড়েছেন বা শুনেছেন, তাঁরা জানবেন – এগুলোকে বলে ভাববিহ্বল। ঠাকুর সর্বদা ভাবে টগবগ করছেন, ফলে একটু টোকা লাগলেই সেই ভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায়। মৌচাক মধুতে ভরা, মৌচাকে একটু খোঁচা দিলে টপটপ করে মধু ঝরতে শুরু হয়ে যাবে। ঠাকুরের ভিতর এই যে ভক্তির প্রেমরস, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় ভিতরটা এমন পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে, একটু ঈশ্বরীয় ভাবের কথা যেমনি শুনছেন, যেটা তাঁর মনকে স্পর্শ করে নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। সেখান থেকে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হয়ে গেল। ওই অবস্থায় ঠাকুরের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরোচ্ছে না।

সেখান থেকে মন যখন একটু নামল, তখন তিনি বলতে লাগলেন –**ভক্তিই সার। তাঁর নামগুণকীর্তন সর্বদা করতে করতে ভক্তিলাভ হয়**” এরপর কয়েকটি লাইন আছে, সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার আগে একটু ব্যাখ্যার দরকার আছে।

স্বামীজীর খুব নামকরা কথা আমরা সবাই জানি – Each Soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. Do this either by work, worship, psychic control and knowledge। আমাদের ভক্তরা এই নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা এই জায়গাতে একটু গুলিয়ে ফেলেন। স্বামীজী এই কথাগুলো যে বলছেন, এখানে একটা প্রস্তুতির কথা বলছেন, মনকে পরিষ্কার করার কথা বলছেন। মন যখন পরিষ্কার হয়ে যায়, ঈশ্বররঞ্জন তখন নিজে থেকেই হয়। হিন্দুরা কোনটাকেই শেষ কথা বলেন না। এই যে ঠাকুর বলছেন, মত পথ; অনন্তের জন্য অনন্ত পথ। যে কোন মূল্যবোধকে যদি পুরোদমে পালন করা হয়, তাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়। সাবিত্রী-সত্যবানের খুব নামকরা কাহনী, সেখানে সাবিত্রী নিজের স্বামীকে খুব ভালবেসেন, স্বামী ছাড়া আর কিছু জানেন না। সেখান থেকে সাবিত্রীর মন শুদ্ধ হয়ে গিয়ে তাঁর মধ্যে সমস্ত ক্ষমতা এসে যায়। মুদগল নামে আমাদের একজন নামকরা ঋষি ছিলেন, তিনি দানধর্মে এমন প্রতিষ্ঠিত যে, তিনি অভুক্ত থেকে যাবেন



তবুও তিনি অতিথিসেবা করবেনই করবেন। দুর্বাশা মুনি এসে ঋষির পরীক্ষা নিলেন, সেখানেও তিনি তাঁর দানধর্ম থেকে সরলেন না। আমরা যত রকমের মূল্যবোধের কথা ভাবতে পারি, তার মধ্যে যে কোন একটি মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার ভিতর এক বিশেষ শক্তি চলে আসে। কর্ণের ব্যাপারে সবাই বলে, সারাটা জীবন লোকটার কত দুর্ভাগ্য। কোন বাড়িতে সহজে নিজের বাচ্চার নাম রাখা রাখে না, কিন্তু কর্ণের নাম অনেকেই রাখে। কর্ণের কাছে শুধু একটাই ছিল—মিত্রধর্ম। বন্ধুর প্রতি আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই যে বন্ধুর প্রতি আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেখান থেকে যে মানুষ কত উচ্চ অবস্থায় চলে যেতে পারে, কর্ণকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি।

স্বামীজী যেভাবে সুন্দর করে যে চারটি পথ নিয়ে এলেন, এটাকে মহাভারতে ওনারা এভাবে দেখতেন না। যে কোন জিনিস, পবিত্রতা, শুচিতা ধর্মে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে কোন একটি মূল্যবোধকে যদি নিয়ে নেওয়া হয়, বিয়ের মধ্যেও ওটাকে ধরে রাখতে পারলে মনটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে, ওখান থেকে যে তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপে ভিতরের আবর্জনাগুলো পুড়ে মনটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, তাঁর নামগুণগানকীর্তন সর্বদা করতে করতে ভক্তিলাভ হয়। নামগুণগান করাটা কিছু ভক্তি না, এটা অপরা ভক্তির মধ্যে পড়ে। অপরা ভক্তি হল, মানুষ যখন প্রস্তুতি নেয়, ধীরে ধীরে সে ভক্তিপথে এগোচ্ছে। এগোতে এগোতে মনটা যখন পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন ঠিক ঠিক ভক্তি জন্মায়। তার আগ পর্যন্ত যত প্রকার ঈশ্বরীয় কথা হয়, এগুলো ইমোশানালিজম্। আমরা যখন বলি, আমাদের ভক্তরাও যখন বলে – ঠাকুরের ইচ্ছা, এগুলো হল ইমোশানালিজম্। কিন্তু যখন ওই স্তরে চলে যান, তখন সেখানে তাঁরা দেখেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া তো কিছু নেইই। এই ইমোশানালিজমগুলিকে কাটানোর জন্য এগুলো দরকার। শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মন পরিষ্কার হয়।

বেশির ভাগ লোক এসে যখন বলে, আমি ভক্ত, তখন বোঝা যায় আসলে এদের জীবনে কিছু নেই। সারা পৃথিবীতে দেখবেন, বেশির ভাগ মানুষেরই জীবনে কিছু নেই। না আছে টাকা-পয়সা, না আছে মান-সম্মান; বাড়ির দুজন লোক তাকে জানে, পাড়াতে হয়ত দুজন জানে, ওখানেই শেষ। এদিকে ভিতরে ভিতরে নিজের একটা ইচ্ছা আছে, আমাকেও পাঁচজন জানুক, মানুষ। কারণ যার মানে হুঁশ আছে সেই মানুষ। আমার একটা মান আছে, আমার আমিত্ব আছে, এই আমিত্বের ব্যাপারে হুঁশ আছে, তাই সে মানুষ। যে বলছে, আমি তো কিছুই না, দীনহীন; মুখে সে বলছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভাবছে, বিনয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর বলছেন, সাধুর সব কিছু যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না, আমিত্ব কখন যায় না। যখন আমাদের কিছু নেই, তখন আমরা ভক্তির দিক থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ করতে চাই। দেখবেন, স্কুলে যে ছেলেগুলো পড়াশোনায় ভাল নেই, এরা অন্যান্য দিকে, খেলাধূলা, নাটক আদিতে এগিয়ে থাকে। সেটাও যদি না পারে, তখন সে দুষ্টমি করে। বাড়িতে যদি আপনার ছেলে বা মেয়ের নামে যদি স্কুল থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করে, তখন বুঝবেন পড়াশোনাতে আপনার সন্তান ভাল নেই, খেলাধূলাতে ভাল নেই, অন্যান্য জিনিসে ভাল নেই। তখন সে কিছু একটা করতে চাইবে, যাতে সবারই দৃষ্টি তার দিকে পড়ে। আমার দিকে সবার যেন দৃষ্টি থাকে—এই ভাব থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। বড় হয়ে যাওয়ার পর মানুষ তো স্কুলের ছেলেদের মত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, তখন ‘আমি ভক্ত’, ‘আমি অমুক মহারাজের শিষ্য’, ‘অমুক মহারাজ আমাকে স্নেহ করে’, এই কথাগুলো এমন ভাবে অন্যদের সামনে বলবে মনে হবে যেন সে বিরাট ভক্ত, সে একজন শ্রেষ্ঠ লোক। কিন্তু মানুষ যখন ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে চলে যায়, তখন সে এগুলো থেকে সরে আসে। ঠাকুর এদেরকে সাত্ত্বিক ভক্ত বলছেন, সাত্ত্বিক ব্যক্তি ধ্যান করে কেউ জানতেও পারে না।

তারপর বলছেন, **আহা! শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া।** এটা উপমা, উপমা জিনিসটা এমন, যেটা দিয়ে কক্ষণ একটা তত্ত্বকে বোঝান যায় না। তত্ত্বকে বোঝানোর জন্য উপমার আশ্রয় নেওয়া হয়। আমরা প্রায়ই এই জিনিসটা ভুল করি। আমরা কোন উপমা দিলে সঙ্গে সঙ্গে যাদের বুদ্ধি আছে, তারা বলবে, কিন্তু এটা তো এ-রকমও হয়। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, সিংহের মত উপমা

দিলে তার যে লেজ থাকতে হবে, তা হবে না। বলাই হয় —উপমা একদেশীয়। একদেশীয় মানে, যতটুকু উপমার জন্য বলা হচ্ছে ঠিক ততটুকুই নিতে হয়।

এই যে এখানে ছানাবড়া বলছেন, যাঁরা তর্ক করেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চারটে কথা বলে দেবেন। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হয়, ছানাবড়া বা যে কোন মিষ্টি যেটা রসে ভেজান হয়, এর দুটো দিক থাকে। যেমন জিলিপি, জিলিপিকে আগে ভাজা হয়, ভাজা হয়ে গেলে পুরো শক্ত হয়ে যায়, এরপর তাকে যখন রসে ছাড়া হয় তখন জিলিপি রসকে টেনে নেয়। তার মানে ওর ভিতর জলের যে অংশটুকু ছিল, সেটাকে যখন ভেজেছে তখন সেই অংশটুকু বাদ চলে গেছে। জলের অংশটুকু বেরিয়ে যাওয়ার পর এবার সে চিনির রসটাকে টেনে নিয়েছে। সাধন-ভজনে ঠিক তাই হয়। ঠাকুর এখানে যে বলছেন —যেন রসে ফেলা ছানাবড়া; অত্যন্ত সাধারণ কথা, জিলিপি, ছানাবড়া সবাই দেখেছেন। জিলিপি বা ছানাবড়ার মধ্যে যে জল থাকে, সেটা অসার, ভেজে ওই অসার বস্তুকে বার করে দেওয়া হয় যাতে সারবস্তু ঢুকতে পারে। সাধন-ভজন, জপধ্যান, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, এগুলো যখন নিয়মত ভাবে করা হয় তখন এরও উদ্দেশ্য হল —আমাদের ভিতরে যে সংসাররূপী জল, বিষয়রূপী যে জল আছে, এটাকে বার করে দেওয়া। নিষ্কার কর্ম করলে, অর্থাৎ কর্মযোগ করলে, অপরের সেবা করলে, অপরকে ভালবাসলে, ভিতরের সংসাররূপী জল, বিষয়রূপী জল আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।

দু-তিন বছর আগে একটি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘রামকৃষ্ণ মিশনে আপনার চল্লিশ বছর হয়ে গেল, কতটা এগোলেন মনে করছেন?’ আমি বললাম, ‘এখন মনে হয় মাঠটা তৈরী হচ্ছে, এরপর ঈশ্বরের কৃপায় যদি বীজ পড়ে তারপর সব হয়ে যাবে’। এমনিতে সাধু সন্ন্যাসীদের দেখে লোকেরা মনে করে সবাই যেন সিদ্ধপুরুষ; কিন্তু সবাই সিদ্ধপুরুষ হন না। আচার্য শঙ্কর, স্বামীজী এনাদের মত মহাপুরুষরা প্রথম থেকেই সিদ্ধ ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সাধু সন্ন্যাসীরা অত দূর যেতে পারেন না। আমরা অনেককেই জানি যাঁরা দিনে চার ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা জপধ্যান করেন। তাতে কি ওনাদের সিদ্ধি হবে? আমার তো তা মনে হয় না। যেটা হবে —বিষয়রূপী জল, সংসাররূপী জল, এই জলটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসবে। এরপরে যখন ঈশ্বরীয় ভক্তিতে নামবে, তখন ভক্তিরসটাকে সে টেনে নেবে। যদি না ভাজা হয়? তাহিলে আর ছানাবড়া হবে না, জিলিপি হবে না। রসে যদি না ফেলা হয়, তাহলেও কিন্তু ছানাবড়া হবে না।

কোন যোগপথ যদি না নেওয়া থাকে, সে কর্মযোগ হোক, ভক্তির পথ হোক, জ্ঞানযোগ হোক, একটা কোন পথ না নিয়ে এমনি যদি নিয়ে রসে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলেও কিছু হবে না। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু যদি করা হয়, যারা সমাজসেবা করছে, এর ওর সেবা করে বেড়াচ্ছে, এরা সবাই অনেক ভাল এতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ আত্মকেন্দ্রিত মানুষদের থেকে এনারা অনেক অনেক ভাল; কিন্তু যেখানে ধর্মের ব্যাপার আসে, সেখানে তারা এগোতে পারবেন না। তার জন্য যেটা করতে হবে, তা হল —ঈশ্বরীয় ভক্তিরসে যদি তাকে চুবিয়ে দেওয়া হয়, বা ওর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখনই সে ভক্তিরস টানবে। এই দুটো জিনিস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ — পরা ভক্তি যতটা দরকার অপরা ভক্তি ঠিক ততটাই দরকার। কোন একটা যদি কম পরে, তাহলে কিন্তু এগোতে পারবে না।

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক, আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। এই জিনিস সবারই হয়ে থাকে। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে আছি, আমরা মনে করি আমরা ঠিক বাকিরা ভুল। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে একবার একটি ধর্মীয় সংস্থা থেকে একজন এসেছিলেন, বয়স্ক মানুষ, পঁচাত্তরের উপর বয়স হবে। মঠে আমার সাথে পরিচয় করানো হল। রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে ওনার কিছু প্রশ্ন ছিল। উনি যে মতের লোক, আমি সেটা জানতাম। উনি তর্ক করে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, আমাদের মত ভুল। আমি খুব সহজ যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাচ্ছি —যদি আপনি বলেন আপনার বইয়ে লেখা আছে যে, আপনাদের মতটাই ঠিক, তাহলে আমিও বলব আমার বইয়ে লেখা আছে,

আমাদের মতটা ঠিক, তাহলে তো দুটোর মধ্যে মারামারি হয়ে গেল। একটা টয়লেট পেপারে লেখা আছে, এখানে যা লেখা আছে এটাই ঠিক, বাকি সব ভুল। যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন এটা ঠিক? বলবে, কারণ টয়লেট পেপারে লেখা আছে। এটা কি কোন যুক্তি হল, হিন্দুরা কক্ষণ এভাবে চলে না।

আমরা যখন বলি, ঠাকুর বলেছেন, তখন এই কথা আমাদের নিজেদের মতের গোষ্ঠীদের মধ্যে বলা হয়; যাঁরা ঠাকুরকে মানেন শুধু তাঁদের কাছে এটা বলা হয়। যাঁরা ঠাকুরকে মানেন না, জানেন না, তাঁদের সামনে এই কথা বলাটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। স্বামীজী বিদেশে গিয়ে এটাই করেছিলেন, সেখানে তিনি এই বলছেন না যে, আমাদের গীতায় এই আছে, আমাদের উপনিষদে এই আছে। অন্যান্য ধর্মে দেখুন, সবাই প্রথমেই বলবে, আমার ধর্মগ্রন্থে এই রকম কথা বলা হয়েছে। তোমার ধর্মগ্রন্থ যে প্রামাণ্য, তোমার ধর্মগ্রন্থ যে ঠিক, এর কি প্রমাণ আছে? যিনি এই ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো বলেছেন, তাঁর হয়ত মাথা খারাপ ছিল, গাঁজাখোর ছিলেন; ওই অবস্থায় যে কোন জিনিস বলা যায়। প্রথম কথা, এটা সবাইকে মানতে হয় যে, আমি যে পথে আছি এই পথ ও মত আমার জন্য, তুমি যে পথে আছ সেটা তোমার জন্য। তর্ক যদি করতে হয় সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা কর। তোমার গ্রন্থ কখনই প্রমাণ হতে পারে না। লোকেরা এই জিনিসগুলো বুঝতে চায় না। ঠাকুর তাই এটা বারবার বোঝাচ্ছেন—**আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হল। অনন্ত পথ—অনন্ত মত।**

**দেখ! ঈশ্বরকে দেখা যায়।** ঠাকুর এ-কথা যে কতবার বলছেন; আমরা এই কথা কত পড়ি, কত শুনি, শুনে মনে হয় আহা কি সুন্দর কথা। কি রকম সুন্দর কথা? শচীন তেঙুলকার খুব ভাল ক্রিকেটার, তাঁর খেলার প্রশংসা করি, টিভির পর্দায় তাঁর খেলা দেখি, সংবাদে তাঁর খবর শুনি, ব্যস, ওখানেই শেষ। শচীন তেঙুলকার এত বড় ক্রিকেটার, তাতে আমার কি! বিল গেটসের এত টাকা আছে, তাতে আমার কি! কথামতে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাতে আমার কি! আমরা কি এটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি? একেবারেই না।

**‘অবাজ্ঞানসোগোচর’ বেদে বলেছে।** খুব নামকরা কথা। ঈশ্বর মন বুদ্ধির পারে। এই কথা আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলা হয়। অন্যান্য ধর্মেও বলা হয়, তবে এ-ভাবে বলা হয় না, একটু অন্য ভাবে বলা হয়। **এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর।** ঠাকুর বারবার বলছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক। মন শুদ্ধ হয়ে গেলে যে কি হয়, এটা জানার কোন উপায় নেই। ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা, বিজ্ঞানসম্মত হলে কতটা বিজ্ঞানসম্মত; এটাকে বুঝতে হলে আপনাকে রাজযোগে যেতে হবে। কথামতে আমরা আর ওই র্যাশানালিটি, সাইন্টিফিক, এই জিনিসগুলোকে ঢোকাতে চাইছি না। ধর্ম যে কত সাইন্টিফিক, এটাকে বুঝতে হলে রাজযোগের লেকচারগুলো ভাল করে শুনতে হবে।

মন মানেই মনের চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য যদি না থাকে তাহলে সেটা আর মন নয়। যতক্ষণ মনে চাঞ্চল্য রয়েছে, যেটাকে বৃত্তি বলা হয়; মনে যতক্ষণ বৃত্তি আছে, তা যে কোন বৃত্তিই হোক না কেন, ততক্ষণ ঈশ্বরজ্ঞান হবে না। তার মানে, এই মন দিয়ে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। কিন্তু মনের বৃত্তিগুলি যখন নাশ হয়ে যায়, তখনই ঈশ্বরজ্ঞান হয়। কিন্তু মনের যদি বৃত্তিগুলি নাশ হয়ে যায়, তখন সেটাকে বলা হয় মনোনাশ। মনোনাশ যদি হয়ে গেল, সেটাকে আর মন বলা যাবে না। সেইজন্য একদিকে এই মনই ঈশ্বরকে জানে, মন ছাড়া ঈশ্বরকে জানার কোন পথ নেই, কিন্তু সেই মনকে বলে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ মন মানে যে মনে কোন চিন্তাবৃত্তি নেই। চিন্তে যদি বৃত্তি না থাকে, মনে চাঞ্চল্য যদি না থাকে, চাঞ্চল্য মানে জ্ঞান। আমরা সমস্ত ধরণের জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে নিচ্ছি, আমাদের পুরনো স্মৃতি থেকে জ্ঞান নিই, স্বপ্ন দিয়ে জ্ঞান নিই, যেভাবেই জ্ঞান নিই না কেন, এটা চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্যকেই বলা হয় মন। চাঞ্চল্য যদি না থাকে সেটা আর মন না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, তিনি বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বিষয়াসক্ত মানে, মন যখন বিষয়ের দিকে থাকে, মনের চাঞ্চল্য তখন অনেক বেশি হয়। পুকুরে ডেউ যদি কম থাকে, তাও একটু বোঝা যায় পুকুরের তলদেশে কি আছে। কিন্তু যখন প্রচুর বাতাস চলে, পুকুরের জল

বেশি নাড়ানাড়ি হলে এত চেউ চলে যে জলের তলাতে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। আমাদের মনে যখন বিষয়ের ঝড় চলে, তখন ঈশ্বরজ্ঞান তো দূরে, ঈশ্বরচিন্তনই সম্ভব না। মন সৎ চিন্তা করছে, এই সৎ চিন্তাটাও একটা বৃত্তি। মন সৎ চিন্তা আর অসৎ চিন্তার মধ্যে তফাৎ করে না, মন কেবল একটাই জানে—চিন্তা। দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করার সময় দাঁড়িপাল্লা বিচার করে না যে, এটা লোহা আর এটা সোনা, ওর কাছে সবটাই ওজন। মনের কাছে চিন্তা মানে চিন্তা—ধর্মচিন্তাটাও চিন্তা, অধর্মচিন্তাটাও চিন্তা। অধর্মের সমস্যা হল, অধর্ম পর পর আরও অনেক কিছুকে জন্ম দিতে থাকে। ধর্ম এত কিছুকে জন্ম দেয় না, ধর্ম আস্তে আস্তে মনকে শান্ত করে।

**বৈষ্ণবচরণ বলত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।** ঠাকুর এখানে বৈষ্ণবচরণের কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, আমরা যেমন বলি, উপনিষদে এই বলেছে, বেদ এই কথা বলছে। **তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন।** এই যে আমরা এক্ষুণি আলোচনা করলাম, ধর্মসাধন করলে, ধর্মের আলোচনা করলে ধীরে ধীরে মনের বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে আসে। অধর্মে কি হয়, অধর্ম বলতে বিষয়ভোগ, ভোগে নিত্যনূতন উপকরণ সব সময় দরকার, সব সময় বিষয়ের দরকার, ফলে মনে সব সময় চাঞ্চল্য চলতেই থাকে। এটা চাই, সেটা চাই; শুধু চাই না, তার সাথে আরও আরও চাই, পুরনো চলবে না, নূতন নূতন চাই। ধর্মের এ-রকম কিছু হয় না। দেখবেন রোজ সকালে যদি সিনেমার চটুল গান, লারেলান্সার গান শুনতে থাকেন, কদিন পরে আপনি বিরক্ত হয়ে যাবেন, কি-সব থার্ডগ্রেড গান রে বাবা। অথচ দেখুন, যাঁরা নিত্য গীতাপাঠ করেন, চণ্ডীপাঠ করেন, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ওই একটাই করে যাচ্ছেন। যাঁদের বাড়িতে নিত্য শাস্ত্রাদি পাঠ, সেখানে একটা শান্তির ভাব এসে যায়। অথচ একই জিনিস করে যাচ্ছেন, রোজ যে নূতন নূতন কিছু করছেন তা না। ধর্মপ্রসঙ্গ করলে, সাধুসঙ্গ করলে, প্রার্থনা করলে মনটা ধীরে ধীরে ধর্মের দিকে চলে যায়। ধর্মের দিকে যাওয়া মানে বৃত্তির নাশ হবে না, কিন্তু বৃত্তি অনেক কমে যায়। ঠাকুর বলছেন, **তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়।**

ধর্মে চিত্তশুদ্ধিটাই হল মূল। যোগশাস্ত্রে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়, এই চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা একটি বৃত্তি থাকা, এটাকেই বলে চিত্তশুদ্ধি। সাধারণ ভাবে আমরা চিত্তবৃত্তি বলতে মনে করি, মনে যে অসৎ চিন্তা, কু-ভাবনা হয় এগুলোকে কাটিয়ে মনে সৎচিন্তা নিয়ে আসা। ঠিকই, এই সৎচিন্তা থেকে আস্তে আস্তে সৎচিন্তাটাও থেমে বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় পৌঁছে যাবে বা একটি বৃত্তি থাকবে। এই চিত্তশুদ্ধি যদি না হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ যদি না হয়, ততক্ষণ ঠিক ঠিক ধর্ম শুরু হবে না। ঠাকুর কলকাতার মেয়েদের উদাহরণ দিয়ে বলছেন—এরা তো এত জপ করে, কিন্তু কই কিছুই তো হয় না। আপনাদেরও অনেক সময় মনে হবে—এত বছর জপ করছি, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না। দিনে দুবার করে বসি, হাজার-দু-হাজার করে জপ করি, কিন্তু কিছুই হয় না। কিছু না হওয়ারই কথা, কারণ চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না। চিত্তশুদ্ধি কেন হচ্ছে না? কারণ মন বিষয়াসক্ত। বিষয়াসক্ত কিছুটা নিজেকে নিয়ে, কিছুটা আপনজনদের নিয়ে।

যে মন বিষয় থেকে বেরিয়ে আসে, সেই মন এই সংসারকে আর বেশি নিত্য মনে করে না। আমি একজনকে জানতাম, ওনার কিছু একটা হয়ে গেল, একটু হয়ত হাত কেটে গেল, কি একটু চোট পেয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হতাশায় চলে যেতেন—‘আমি অভাগা’ বলেই অনেক কিছু বলতে শুরু করে দেবেন, আমারই যত কষ্ট, আমারই উপর যত ঝামেলা। আমি একদিন বললাম, ‘আপনি জগৎকে এত সত্য বলে মনে করেন, সংসারকে এত নিত্য বলে মনে করেন; ফলে নিজের শরীরকেও বড় বেশি সত্য বলে মনে করছেন’।

আমাদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, একবার গাড়িতে যাওয়ার সময় কোন কারণে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তিনি মেরুদণ্ডে চোট পান। পরে তার জন্য একটা বড় অপারেশান করতে হয়েছিল। ডাক্তাররা বলে দিলেন, অনেকদিন বিছানায় থাকতে হবে। কিন্তু কোথায় বিছানা, অপারেশান হল, পরের দিন থেকে উঠে যথারীতি তিনি আবার নিজের কাজ করতে শুরু করে দিলেন। আরও অনেক

মহারাজদের এই ধরণের অনেক ঘটনা আমরা জানি। ফলে কি হয়, কোথাও যে দেহের প্রতি একটা আসক্তি, এটা কমে যায়। দেহের প্রতি আসক্তি চলে গেলে তখন কি হয়, দেহ নিজের মত চলে আর আপনি আপনার মত চলবেন; এগুলোই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ।

অশুদ্ধ চিত্তের মানুষ শরীরকে নিয়ে বড্ড বেশি ভাবে। অশুদ্ধ চিত্ত আপনজনকে নিয়ে বড্ড বেশি ভাবে। অশুদ্ধ চিত্ত সংসারের সব কিছুর খবর রাখা, পাঁচজনের খবর রাখা, তারপর মিথ্যা কথা বলা, কল্পনার কথা বলা, তারও বেশি পরনিন্দা-পরচর্চায় ডুবে থাকা, এগুলোকে নিয়ে বেশি মজে থাকে। এদের কাছে জগৎটা বড্ড বেশি সত্য। এগুলোই অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ। অশুদ্ধ চিত্ত হলে কি হয়, আপনি যতই জপ করুন, যতই শাস্ত্র পড়ুন, এগোন খুব মুশকিল। ঠাকুর এই কথাই এখানে বলছেন—তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, তবে তাঁর দর্শন হয়। ঈশ্বরের কৃপা, ঈশ্বরের দর্শন, এগুলো কখন হয়? যখন চিত্তশুদ্ধি হয়। তার আগে যা কিছু করা হচ্ছে, এগুলো করা হচ্ছে মনের চিত্তশুদ্ধির জন্য। শেষে বলছেন—ঘোলাজলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আরশিতেও মুখ দেখা যায় না।

চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ করলে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। আগে থাকতে লোকচার দেওয়া ভাল নয়। একটা গানে আছেঃ ভাবছো কি মন একলা বসে, অনুরাগ বিনে কি চাঁদ গৌর মিলে। এই কথা ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছেন। ঠাকুর চারটে ধাপের কথা বলছেন। এই চারটে ধাপের আগে প্রথমে আসে অপরা ভক্তি, যেটাকে বৈধী ভক্তিও বলা হয়, স্বামীজী যেখানে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, এই কথাগুলো বলছেন; এগুলো হল প্রস্তুতি নেওয়া। এই প্রস্তুতি নিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধির ফলস্বরূপ সংসার থেকে মন সরে আসে, দেহ থেকে মন সরে আসে, আপনজন থেকে মন সরে আসে। এই চিত্তশুদ্ধি হলে তারপরে ভক্তিলাভ হয়।

ভক্তি নিয়ে আবার অনেক সংশয় আছে। উপনিষদে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হয়, সেটাও ভক্তি—আত্মতত্ত্বের প্রতি ভক্তি। যোগে যে স্বরূপে অবস্থানের কথা বলছেন, এটাও ভক্তি—নিজের স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার যে তত্ত্ব, এটার প্রতি ভক্তি। সবটাই ভক্তি, চিত্তশুদ্ধি যদি ঠিক ঠিক না হয়, মন যদি শুদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু তত্ত্বের প্রতি ভক্তি হবে না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির এক জায়গায় এই কথা বলছেন—মানুষ যখন অসৎ আচরণ করা থেকে সরে আসে, তখন ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা জন্মায়। সেই শ্রদ্ধাকে যখন সে ধরে রাখে, তারপরে সে ভক্তির দিকে এগোয়।

বলছেন, ‘তাঁর কৃপায়’; আপনি জপধ্যান করে যাচ্ছেন, সাধনা করে যাচ্ছেন, ঈশ্বরের নাম করে যাচ্ছেন, ফলে আপনার চিত্তশুদ্ধি হবে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হলেই কি ঈশ্বরলাভ হয়ে যাবে? কদিন আগে দেখলাম ইউটিউবে একজন এটাকে নিয়ে লিখেছেন। আমি মায়ের উত্তরটা লিখলাম—ঠাকুর কি আলু, পটল যে, এত জপ করেছেন বলে আপনার দর্শন হয়ে যাবে? এটা কোন ইমোশানাল কথা না, খুব সিম্পল একটা লজিক এটা। কার্য-কারণ সম্পর্ক শুধু মনের রাজ্যে চলে, নিউটনের যে ফিজিক্সের সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে, সেগুলো মনের রাজ্যে চলে। ধর্মকর্ম করলে পূণ্য হবে, এটা মনের রাজ্যে চলে। অধর্ম করলে পাপ হবে, এটা মনের রাজ্যে চলে। ঠাকুর এখানে বলছেন, *অবাজানসোগোচরম্*, তিনি বাক্য ও মনের পারে; ভগবানের কাছে এই নিয়ম চলে না। আপনি জপ করলে তিনি দেখা দিতে পারেন, জপ না করলেও দেখা দিতে পারেন, কিছু বলা যায় না। আর এটা কেন হয় কেউ জানে না।

কিন্তু সদাচার করে, সাধুসঙ্গ করে ধর্মের প্রতি যখন নিষ্ঠা জন্মায়, ধর্মের প্রতি যখন বিশ্বাস জন্মায়; তখন আপনি জানেন, আমি এটাই করব। আমরা যাঁরা সন্ন্যাসী আছি, আমাদের যাই হয়ে যাক, আমরা এখানেই থাকব। এটাই আমাদের way of life, এটাই আমাদের জীবনধারা। এটা যে আমরা অসহায় হয়ে, নিরুপায় হয়ে করছি তা না, এটাই আমাদের way of life। ধর্ম আচরণ করতে করতে ওটাই way of life হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুঃখ-কষ্ট এলেও, আপদ-বিপদ এলেও, ধর্ম আচরণ করা

আপনি ছাড়বেন না। এরপরে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। এরপর ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন—**দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়।** যেমন ইসলাম ধর্মে প্রফেট মহম্মদকে আল্লা আদেশ করলেন, তুমি আমার নাম প্রচার কর। **আগে থাকতে লোকচার দেওয়া ভাল নয়।**

এরপর ঠাকুর গান করছেন— মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, পোদো শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল, খুব নামকরা গান। পদ্মচরণ নামে একজন ছিল, গ্রামের লোকেরা তাকে পোদো পোদো বলে ডাকে। গ্রামে একটা পোড়ো মন্দির ছিল, একদিন সেখানে গিয়ে পোদো ভেঁ ভেঁ করে শাঁক বাজাতে লাগল। ঠাকুর এই কথা অনেকবার বলছেন—আদেশ না পেলে লোকশিক্ষা হয় না। আপনাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন উঠতে পারে, ‘আচ্ছা স্বামী সমর্পণানন্দ মহারাজজী আপনাকে কি ঠাকুর আদেশ দিয়েছেন, আপনি যে এত লোকশিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন?’ আমরা লোকশিক্ষা দিই না। ঠাকুর আদেশ করেননি ঠিকই, কিন্তু এই সজ্ঞ হল ঠাকুরের স্থূল শরীর, এই কথা স্বামীজী বলে গেছেন; এই স্থূল শরীর আমাকে আদেশ করেছেন—তুমি এই এই শাস্ত্রের পাঠ ও ব্যাখ্যা করবে। এইরূপে আমরা কিন্তু আদেশ পেয়ে আছি। ঠাকুর যতক্ষণ দর্শন দিয়ে না বলছেন, ততক্ষণ ঠাকুরের যে স্থূল শরীর এই রামকৃষ্ণ সজ্ঞ, তাঁর আদেশে আমরা করছি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা কিন্তু লোকশিক্ষা দিই না। কোন সন্ন্যাসী, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসী বলবেন না যে, তিনি লোকশিক্ষা দেন। ভক্তরা কি করবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন? *কথয়ন্তুচ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, আমার কথা শুনবে, আমার কথা বলবে, আমার কথা স্মরণ করবে, এটাতেই আনন্দ পাবে। ঠাকুরের কথা পরিবেশন করছি, এতে আপনিও রমণ করছেন, আমিও রমণ করছি। আপনিও যদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, নিজের মত করবেন; যাঁরা শুনছেন তাঁরা নিজের মত শুনবেন। ওই সময়টুকু একটা উচ্চ অবস্থায় থাকা। আচ্ছা আমি যদি কথামতের ব্যাখ্যা না করতাম, তাহলে কি করতাম? কি আর করতাম, মন কিছু না কিছু করতেই থাকবে, সময় এমনিই কেটে যায়; তার থেকে এটা অনেক ভাল। তার মধ্যে কখন কোন কথা কার মনে কিভাবে লেগে যাবে, সেখান থেকে তার জীবন পরিবর্তন হয়েও যেতে পারে, যদিও সেটা আমরা জানি না।

**হৃদয়মন্দির আগে পরিষ্কার করতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয়; পূজার আয়োজন করতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভেঁভেঁ করে শাঁক বাজানো, তাতে কি হবে? ব্রাহ্মভক্তদের ঠাকুর বারবার এই কথা বলতেন।**

এইবার উপাসনা শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের এটা একটা পুরনো সমস্যা, বিশেষ করে মুসলমানরা যবে থেকে, বিশেষ করে খ্রীশ্চনরা এই দেশে এলো, তবে থেকে কোথায় একটা সমস্যা হয়ে গেল; হিন্দুদের মনে হতে লাগল আমরা হীন, আমাদের গ্রন্থে দোষ আছে। হিন্দুদের মত ধর্ম হয় নাকি! আমার বই ‘হিন্দু জীবনধর্ম’, সেখানে শেষের দিকে লিখেছি—Hinduism is the greatest gift of God to humanity। একমাত্র হিন্দু ধর্মের কাছে এই আত্মবিদ্যা রয়েছে, জীবনমুক্তির কথা একমাত্র হিন্দুদের কাছেই আছে। তুমিই ঈশ্বর, এই কথা হিন্দু ধর্ম ছাড়া কেউ বলে না, কোন ধর্ম এই কথা বলে না, বলতে পারবেও না। সেই ধর্মকে কয়েকজন পড়াশোনা করা লোক হীন মনে করছে। সেই থেকে ওদের জিনিসগুলোকে কপি করে হিন্দুদের মত করে বলতে শুরু করল—আমরা পাপী, আমি পাপী, আমাকে শুদ্ধ কর। আরে কিসের পাপ! দু-চারটে দোষত্রুটি সবারই হয়, আমারও কত দোষত্রুটি আছে। আমাকে কেউ কিছু বললে আমি উড়িয়ে দিই। কিসের দোষত্রুটি, রাজার ব্যাটা আমি, আমি ঈশ্বরের সন্তান, কিসের দোষ, কিসের ত্রুটি! সিংহের বাচ্চা কখন হুঁদুর হয় না, সিংহের বাচ্চা কখন ছাগল হয় না। ঠিক ঠিক যদি মনে করি আমি ঈশ্বরের সন্তান, তাহলে আমার আবার কিসের পাপ, কিসের দোষ, কিসের ত্রুটি! মনে করি না বলে আজকে আমাদের এই দুরবস্থা।

ইদানিং কালে যখন বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করে, ওরা mean করে বায়োলজিক্যাল ফাদার। নূতন শব্দ –biological father। কত রকম ফাদার – biological father, guardian father, adopted father, আমাদের আসল ফাদার ওপরওয়াল্লা, গড্। Biological father mother থাকতে পারে, ওর কোন দাম নেই। আমেরিকাতে জিজ্ঞেস করে, তোমার বায়োলজিক্যাল ফাদার কে। এখন যে নানা রকমের আর্টিফিসিয়াল বেবী, টেস্টটিউব বেবী হচ্ছে, জানেও না কোথা থেকে কে এসেছে। ভিতরে যে জীবাত্মা ইনিই আসল। এই শরীর যার মাধ্যমে আসার এসেছে, এর কোন দাম নেই। ঠিক ঠিক বাবা-মা একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ না। আমি যদি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের সন্তান হই, ঈশ্বর হলেন অপাপবিদ্ধ, তাহলে আমার আবার কিসের পাপ! তবে হ্যাঁ, যখন আমি ঈশ্বর থেকে সরে যাচ্ছি, তখন এটা আমার দোষ। উপাসনা হয়ে গেছে। উপাসনার পর ঠাকুর বলছেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) – আচ্ছা, তোমরা এত পাপ পাপ বললে কেন? পাঠ হয়েছে, পাঠের সময় ঠাকুরের সামনে পাপ, পাপ বলে যাচ্ছেন। একশোবার ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ বললে তাই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস করা চাই যে, তাঁর নাম করেছি – আমার আবার পাপ কি’?**

এখানে ছোট্ট করে কটা কথা বলে নিই – হিন্দুদের মধ্যে পাপের ধারণা নেই। ইংরাজীতে যে ‘sin’ বলা হয়, স্বাভাবিক ভাবে আমরা এর অনুবাদ করি ‘পাপ’, মহাভারত আদিতে পাপের কথা আছে, কিন্তু ইংলিশে ‘sin’ যেটাকে বলা হয়, ওটাকে অনুবাদ করে আমাদের এখানে যে ‘পাপ’ শব্দ হয়ে আসে, এই দুটো আলাদা। Sin মানে হয়, ঈশ্বরের কিছু আদেশ আছে, সেই আদেশের বিরোধিতা করা বা অমান্য করা বা তার বিপরীত গেলে সেটা হয়ে যায় পাপ। সেই পাপের দণ্ড ঈশ্বর দেবেনই দেবেন। যেমন আদম আর ঈভকে ঈশ্বর আদেশ করলেন, তোমরা স্বর্গের আপেল খাবে না, কিন্তু তারা খেল। এটা পাপ, কারণ তারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছে। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর কখন আদেশ করেন না। বেদে কোন আদেশ নেই, উপনিষদে কোন আদেশ নেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে ইত্যাদেশঃ, এটা গুরুর আদেশ, ঈশ্বরের আদেশ না। গুরুর আদেশকে উল্লঙ্ঘন করার দৃষ্টান্তও আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য নিজের গুরুরকে বললেন, ‘আপনার মত গুরু আমার লাগবে না। যে গুরুর এত অহঙ্কার, শিষ্যের উপর যে গুরুর ভরসা নেই, এই গুরু আমার লাগবে না’। তার মানে, নিজের ভিতরে যে শক্তি, নিজের ভিতরে যে শ্রদ্ধা; আত্মশ্রদ্ধা, এটাই আসল। হিন্দুদের হল ঠিক ঠিক আত্মশ্রদ্ধার ধর্ম। এখানে অহঙ্কারের কিছু নেই। আমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বর বই আমার আর কিছু লাগবে না। যে শাস্ত্র আমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই শাস্ত্র আমার কাছে ধর্মশাস্ত্র, যে লোক আমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি আমার গুরুসম, যিনি আমাকে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছেন ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্য তিনি আমার গুরু; এখানেই কাহিনী শেষ, এরপরে কারুর কোন গুরুত্ব নেই। বাবা-মা যদি আমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যান, ভাল, তিনিও আসুন আমার সাথে। যীশু যেমন বলছেন, কে আমার মা, কে আমার ভাই; ঈশ্বরের পথে যে আমার সাথে আছে সেই আমার মা, সেই আমার ভাই; বাকিরা কিছু না। তাই বলে তিনি কাউকে অবহেলা করছেন না। যীশু ক্রুশবিদ্ধ, মা এসেছেন, যীশু শিষ্যদের বলছেন, তোমরা আমার মাকে দেখবে। হিন্দুদের পাপ হয় না, হিন্দুদের কি হয় – পথ থেকে একটু সরে যাওয়া। যে ঈশ্বরের পথে আছে, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন নেই, ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের দিকে মন, সংসারের দিকে মন। এটাকে আপনি পাপ বলতে পারেন, এটাকে আপনি দোষ বলতে পারেন; কিন্তু খ্রীস্টানরা যে অর্থে পাপ বলে সেই অর্থে এটাকে পাপ বলা যাবে না।

**তিনি আমাদের বাপ-মা; তাঁকে বল যে, পাপ করেছি, আর কখনও করব না। যদি আপনার মন খুঁত খুঁত করে, আমি দোষ করেছি; ঠাকুর বাবা-মা, তাঁকে বলুন, ঠাকুর আমি দোষ করেছি, আর করব না। শেষে বলছেন –আর তাঁর নাম কর, তাঁর নামে সকলে দেহ-মন পবিত্র কর –জিহ্বাকে পবিত্র কর। ঈশ্বরের নাম করলে দেহ-মন পবিত্র হয় আর নাম করতে করতে জিহ্বা পবিত্র হয়। পূজ্যপাদ স্বামী**

রঙ্গনাথানন্দজী আমাদের বলতেন, তিনি যখন ছোট ছিলেন, তখন নিজের গ্রামের কোন ছেলের কাছ থেকে একটা গালাগাল শিখে কাউকে গালাগাল দিয়েছেন। ওনার মা জানতে পেরেছেন। মা তাঁকে ডেকে বলছেন, ‘দেখ বাবা! এই জিহ্বা হল মা সরস্বতীর স্থান, নোংরা কথা বলা মানে মা সরস্বতীকে অপমান করা, নোংরা কথা কখন বলো না’। মহারাজজী বলতেন, সেদিন থেকে উনি জীবনে আর কোন দিন অপশব্দ ব্যবহার করেননি। ঠিক তেমনি, টাকা-পয়সা হল লক্ষ্মী –এর অপব্যবহার করতে নেই, সদ্যব্যবহার করতে হয়। জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমার কাছে যখন মনি অর্ডার আসত, তিনি টাকাটা হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে জায়গায় রাখতেন। টাকা হল লক্ষ্মী। বাক্ জিহ্বা থেকে বেরোয়, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে জিহ্বাকে পবিত্র করতে হয়, আর নামজপ করতে করতে শরীর পবিত্র হয়, মন পবিত্র হয়। এই হল ২৬শে নভেম্বরের বর্ণনা এবং এর সাথে ষষ্ঠ পর্বও এখানে শেষ হচ্ছে। এরপর আমরা পরের পর্বে প্রবেশ করব।